কিশোর চিলার

# ভূতের গাড়ী

রকিব হাসান

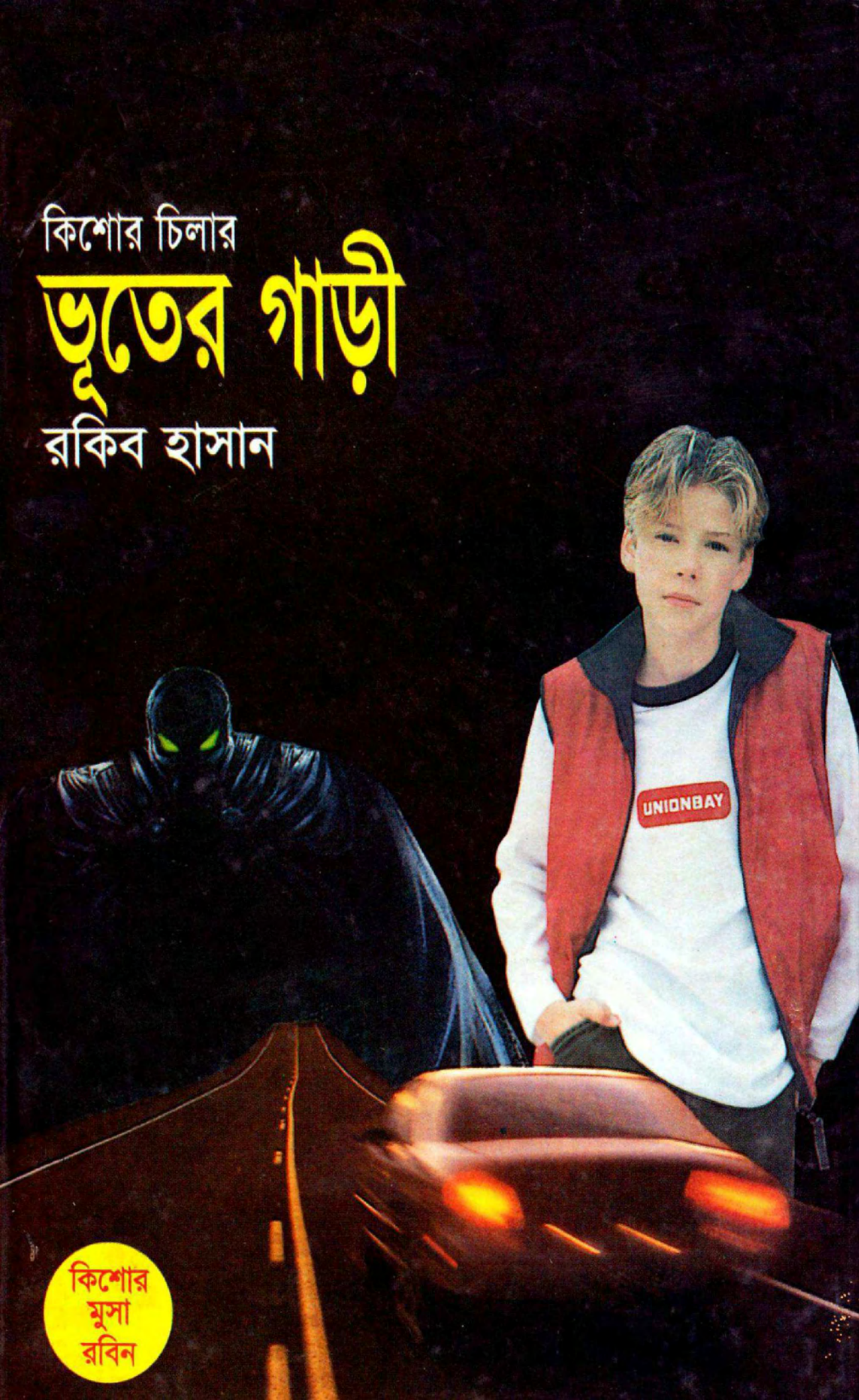


কিশোর
মুসা
রবিন

তিন বন্ধু
কিশোর চিলার

# ভূতের গাড়ি

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

# পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই, আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কিন্তু কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের;
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

# এক

একটা ফিফটি সেভেন মডেলের শেভি ইমপালা গাড়ি আছে আমার ঘরে। দুই ধরনের নীলের মিশ্রণ ওটার বডিতে। কিনারগুলোতে লালচে-রূপালী রঙ যেন আগুনের মত জ্বলছে।

টুইন-ক্যাম ইঞ্জিন আর ভেতরটা কালো চামড়ায় মোড়ানো বিরানব্বই মডেলের একটা ফায়ারবার্ড ভি-৮ও আছে আমার। আছে একটা এইটি থ্রী মডেলের সিলভার ক্যামারো, যেটার কাজ শেষ হয়নি এখনও।

হ্যাঁ, সবই মডেল। আমার বেডরুমের দেয়ালে বসানো বুকশেলফগুলোতে আমার তৈরি করা মডেল গাড়ি দিয়ে ভরে ফেলেছি।

বাবা বলেছে, অন্য দিকের দেয়ালটাতেও একটা তাক তৈরি করে ফেলতে। যাতে নতুন নতুন আরও মডেল বানিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। তার কারণ ওই দেয়ালে লাগানো রয়েছে নানা রকম রেসিং কারের পোস্টার। ওগুলো আমার ভীষণ পছন্দের জিনিস। একটা পোস্টারে এমনকি মারিও অ্যানদ্রেতির সইও করা আছে। যাদের গাড়ি সম্পর্কে ধারণা নেই, তাদের জানাই, এই লোকটি অতি বিখ্যাত একজন রেস কার ড্রাইভার। একেবারে কিংবদন্তী।

সেই অর্থে বলতে গেলে আমিও কিংবদন্তী। কারণ আমাদের স্কুলের যে কারও চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি।

আমার নাম মুসা আমান।

মাঝে মাঝে আমার বন্ধু কিশোর আর রবিনের সঙ্গে একটা খেলা খেলি আমি। দূর থেকে কোন গাড়ি আসতে দেখলে কাছে আসার আগেই বলে দিতে হবে ওটা কি গাড়ি। যে আগে বলতে পারবে তার জিত। সাধারণত আমাদের বাড়ির কাছে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে খেলাটা খেলি তিনজনে।

সব সময় আমিই জিতি। চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারি কোন্‌টা কোন্ গাড়ি।

বস্তা বস্তা কার ম্যাগাজিন পড়েছি আমি। যখন পড়ি না কিংবা গাড়ির মডেল বানাই না, তখন গাড়ির ছবি আঁকি।

রাতে কি স্বপ্ন দেখি জানো? দেখি, গাড়ি চালাচ্ছি।

এ কাহিনীর শুরু শনিবারের এক শান্ত বিকেলে। সেদিন সারাটা দিনই প্রায় বৃষ্টি হয়েছে। তখনও থেকে থেকে ঝোড়ো বাতাসে তাড়িয়ে এনে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে ফেলছে আমার বেডরুমের জানালার কাঁচে।

ফেলুক। বৃষ্টি আমার ভালই লাগে ঘরে বসে যখন মডেল তৈরি করি। টেবিলের ওপর ঝুঁকে গভীর মনোযোগে কাজ করছি। ডায়াগ্রাম দেখে দেখে তৈরি করছি সিলভার ক্যামারোটা।

কাজটা বেশ জটিল। অসংখ্য টুকরো জোড়া লাগিয়ে আস্ত গাড়িটা বানাতে হয়। চেসিসটা বানিয়ে ফেলেছি। ফাইবারগ্লাসের টুকরোগুলো তাতে লাগিয়ে বডিটা তৈরি করতে গিয়ে একটা ফেন্ডার পেলাম না। ড্রয়ার-ট্রয়ার টেনেটুনে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। পাওয়া গেলই না। অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে

বানিয়ে রেখেছি। ফারিহা এ সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেক সময়। ভাবলাম, ও হয়তো বলতে পারবে কোথায় আছে। ভুলে ওর ঘরে নিয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

উঠে ওর ঘরে রওনা হলাম।

ফারিহা আমার খালাত বোন। তার বাবা-মা, অর্থাৎ আমার খালা-খালু কি কাজ করেন জানি না, মাকে জিজ্ঞেস করলেই জবাব দেয় 'কাজটা গোপনীয়'। কি কাজ, বলে না। এতদিনে আমার ধারণা হয়ে গেছে, স্পাইয়ের কাজ করেন হয়তো তাঁরা। মেয়েকে রেখে গেছেন আমাদের বাড়িতে।

আমাদের এ বাড়িটা নতুন। বাড়ির আশেপাশে প্রচুর জায়গা থাকলে বাবার খুব ভাল লাগে। সে-জন্যেই সস্তায় পেয়ে যাওয়া বহু পুরানো বাড়িটা কিনে বসেছে বাবা। পছন্দ হওয়ার আরও কারণ আছে। বাড়িটা পাহাড়ের একেবারে চূড়ার কাছে। শহর থেকেও দেখা যায়। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখতে লাগে একেবারে হরর সিনেমার ভুতুড়ে প্রাসাদের মত, হয়তো সে-কারণেই বাড়িটা আরও বেশি পছন্দ হয়ে গেছে বাবার। কারণ বাবা সিনেমার লোক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভূত আছে এ বাড়িতে। আবছা অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে গা ছমছম করে। মনে হতে থাকে যে কোন সময় যে কোন অন্ধকার কোণ থেকে ভূত বেরিয়ে এসে ঘাড় মটকে দেবে আমার।

এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় ফারিহার ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে আবার সেই গা ছমছমে অনুভূতিটা হতে লাগল আমার।

লম্বা, অন্ধকার হলওয়েটার দিকে তাকালাম। শেষ মাথার খুদে জানালাটা দিয়ে চুইয়ে ঢুকছে ধূসর আলো। সিলিঙের বাতিগুলো লাগানো শুরু করেছে বাবা। একা পেরে উঠছে না। সাহায্য করার জন্যে কাউকে দরকার। মা বলছে মেকানিক নিয়ে আসতে। কানই দেয় না বাবা। বলে, নিজের কাজ নিজে করা ভাল।

বাতি নেই বলে জায়গাটা সব সময়ই অন্ধকার থাকে। দেয়ালে লাগানো পুরানো ওয়ালপেপারের হতশ্রী অবস্থা। কুঁকড়ে গেছে। ছিঁড়ে উঠে গেছে কোথাও, কোথাও উল্টো হয়ে ঝুলছে। উজ্জ্বলতা হারিয়েছে সেই কবে কোন্‌কালে কে জানে!

ফারিহার ঘরের দিকে যাওয়ার সময় পায়ের চাপে মচ্‌মচ্‌ করতে লাগল কাঠের মেঝে।

ওর ঘরটা অন্ধকার। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিলাম। বৃষ্টিভেজা কাঁচের ভেতর দিয়ে ধূসর আলো ঘরে ঢুকছে। ও নেই ঘরে। বাথরুমে গেল নাকি? না। তাহলে ঘরে আলো থাকত। নিচে চলে গেছে বোধহয়। টেলিভিশন দেখছে। রান্নাঘরে থাকবে না। কারণ মা নেই বাড়িতে। বাজারে গেছে।

কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে ফিরে আসতে যাব, চোখ পড়ল ওর কাপড় রাখার আলমারিটার আধখোলা দরজাটার দিকে। ভুতুড়ে একটা মূর্তিকে ভাসতে দেখলাম ভেতরে।

# দুই

আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

'বাবাগো! ভূত!' বলে দৌড় দিতে গেলাম। কিন্তু পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যেন শিকড় গজিয়ে গেছে। তুলতেই পারছি না। ভয়ে এমন হয়েছে। চোখ আটকে গেছে ভূতটার ওপর।

আবছা আলোয় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বোঝার চেষ্টা করলাম ওটা সত্যি ভূত নাকি।

বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। ভূত নয়। তাকিয়ে আছি ফারিহার ময়লা কাপড় রাখার ব্যাগটার দিকে। বাতাসে দুলছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

মনে মনে নিজেকে গালাগাল করলাম খানিক। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনেও আর এক্স-ফাইল দেখব না। ইদানীং যেন ভূতে পেয়েছে টিভি সিরিজটাকে। খালি ভূতের ছবি দেখায়।

ঘরে ঢুকলাম। আলো জ্বেলে ফারিহার পড়ার টেবিল, ড্রয়ার ঘাঁটলাম। এখানেও পেলাম না ফেন্ডারটা।

'কি খুঁজছ?'

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাব।

ঘুরে তাকালাম। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ফারিহা।

বুকে ফুঁ দিতে দিতে বললাম, 'এমন করে কথা বলে কেউ? এ ভাবে চমকে দেয়?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি খুঁজছ?'

ফেন্ডারটার কথা জিজ্ঞেস করলাম। মাথা নাড়ল ও। জানাল, দেখেনি।

তাহলে কোথায় গেল? নিজের ঘরেই ভালমত খুঁজে দেখতে হবে একবার। হলওয়েতে বেরিয়ে এলাম। ঠিক এই সময় ধড়াম করে একটা শব্দ। কেঁপে উঠল বাড়িটা।

চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম দু'জনেই।

'নিচে!' বলেই দৌড় মারলাম।

হল ধরে ছুটছি। মচ্‌মচ্‌ করছে মেঝের তক্তা। সিঁড়িতে পৌঁছে রেলিং ধরে একেক লাফে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে নিচে নামতে লাগলাম।

অর্ধেক নামলেই লিভিং রুমটা দেখা যায়। কিসের শব্দ হয়েছে বুঝতে পারলাম। দেয়াল থেকে খসে পড়েছে একটা বুকশেলফ। গত সপ্তাহে বানিয়েছিল বাবা।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে,' তাড়াহুড়া করে নামতে গিয়ে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল ফারিহা। শক্ত করে রেলিং চেপে না ধরলে পড়েই যেতাম।

'দেখে নামতে পারো না!' গুঙিয়ে উঠলাম আমি। হাত তুলে দেখালাম, 'বাবার বুক-কেসটা।'

দুই হাতে রেলিঙ চেপে ধরে ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে লিভিং রুমের দিকে তাকিয়ে রইল ফারিহা।

বললাম, 'ভূতের কাজ! এমনই করে ভূতেরা!'

আমার দিকে ফিরে তাকাল ফারিহা। 'মানে?'

'মানে আবার কি? সহজ,' পড়ে থাকা বুকশেলফটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলাম। 'ভূতের কাজই হলো শয়তানি করা। ভূতেই ফেলেছে ওটা। আমি জানি।'

গুঙিয়ে উঠল ফারিহা। 'মুসা, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! ভূত হয় কি করে? খালুর দোষে পড়েছে ওটা। খালু কি আর মিস্ত্রী। কোনবার কি কোন বুকশেলফ বানিয়ে সাত দিনের বেশি দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছে? পারেনি। তা-ও কাঠমিস্ত্রী হওয়ার শখ যায় না!'

'শুনে ফেলেছি কিন্তু,' বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল বাবা। মাটির নিচের ঘরে কাজ করছিল। হাতে লেগে থাকা তেলকালি দেখেই বোঝা যায় কিছু একটা বানাচ্ছিল।

পরনের ঢোলা প্যান্টে রঙ লেগে আছে। পুরানো শার্টটার বেশ কয়েকটা বোতাম গায়েব। শার্টের সামনের দিকেও কালি লেগে আছে।

বুকশেলফটার দিকে এগোল। দেখেটেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'ব্র্যাকেট ভাল ছিল না।'

হেসে ফেলে ফারিহা বলল, 'মুসার ধারণা, ভূতে ফেলেছে।'

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল বাবা। 'মুসা, রোগটা তোর বেড়ে গেছে। এ রকম করতে থাকলে সত্যি সত্যি একদিন তোর মা তোকে ধরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।' শেলফটার দিকে ফিরল বাবা। 'ভূতে ফেলেনি। ব্র্যাকেট খারাপ ছিল।'

চেয়ারগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে বুকশেলফটার কাছে দাঁড়াল বাবা। ওপরের দিকটা চেপে ধরে টান দিয়ে খাড়া করল। ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল দেয়ালের সঙ্গে।

একটা ভাস ভেঙেছে। আর গোটা তিনেক ছবির ফ্রেম। সেগুলো দেখিয়ে বাবা বলল, 'তোর মা দেখলে মোটেও খুশি হবে না।'

বাকি সিঁড়িটাও পার হয়ে লিভিং রুমে নেমে এলাম আমি আর ফারিহা। মেঝে থেকে বইপত্রগুলো তুলে তুলে কফি টেবিলে রাখতে লাগলাম।

'যাবি নাকি আমার সঙ্গে, হার্ডওয়্যার স্টোরে?' বাবা বলল, 'ব্র্যাকেট কিনে নিয়ে আসিগে। কাজ আছে তোদের?'

'না,' খুশিই হলাম আমি। 'আঠা আর কিছু ফাইবারগ্লাস কিনতে হবে আমারও। একটা ফেন্ডার পাচ্ছি না। ক্যামারোটার জন্যে নতুন করে একটা তৈরি করতে হবে আবার।'

'যা, জ্যাকেট পরে আয়। তাড়াতাড়ি করবি,' বাবা বলল।

তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু পাহাড়ের ওপরে খুব নিচুতে ভেসে বেড়াচ্ছে ভারী মেঘ। চকচক করছে আমাদের সামনের লনটা। টুপটাপ করে এখনও ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে গাছের পাতা থেকে।

আমাদের সামনের আঙিনাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকার দিকে। ধোঁয়াটে ধূসর কুয়াশায় ঢাকা উপত্যকা। শহরটা চোখে পড়ছে না।

আমাদের গাড়িটা পার্ক করা রয়েছে ড্রাইভওয়েতে। চোদ্দ বছরের পুরানো একটা ক্রাইসলার লেবারন গাড়ি। ক্যাটক্যাটে সবুজ রঙ। মরচে পড়া বাম্পার। একটা হেডলাইট ভাঙা। বাতিল হয়ে গেছে অনেক আগেই। বেশির ভাগ সময় এখন গ্যারেজে পড়ে থাকে।

'একটা নতুন গাড়ি যে কবে পাব আমরা!' সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে

বসলাম।

ভ্রূকুটি করল বাবা। 'যতবার গাড়িতে উঠবি, ততবার ওই এক কথা।'

ফারিহা পেছনে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল।

ইগনিশনে মোচড় দিয়ে ধরে গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ দিল বাবা। তৃতীয়বারের চেষ্টায় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্টার্ট নিতে রাজি হলো ইঞ্জিন। খানিকক্ষণ বসে থেকে গরম হওয়ার সুযোগ দিল বাবা। তারপর ড্রাইভওয়ে ধরে পিছানো শুরু করল।

'স্টার্টই নিতে চায় না,' বাবাকে বললাম। 'দেখলে, গরম হতে কতক্ষণ লাগাল? বাবা, গাড়ির বিজ্ঞাপনগুলো ভালমত দেখেছি আমি। কেনার দরকার হয় না এখন আর। লীজও নেয়া যায়।'

'নতুন গাড়ি দরকার নেই আমার,' সাফ জবাব দিয়ে দিল বাবা। 'এটাতে অসুবিধেটা কি হচ্ছে? ভালই তো চলছে।'

হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বাবা। স্টিয়ারিংটা শক্ত বলেই বোধহয় এমন করে চালায়। রাস্তাটা কোথাও অনেক ঘুরে, কোথাও তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে নেমে গেছে নিচের উপত্যকার দিকে।

যতই নিচে নামছি, কুয়াশা ঘন হচ্ছে ততই। ধূসর কুয়াশা ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদেরকে ঘিরে। হেডলাইট জ্বেলে দিল বাবা। তাতে তেমন সুবিধে হলো না। বরং কুয়াশা আলোটাকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিতে লাগল গাড়ির ভেতরে।

'বাপরে কি কুয়াশা! দুই ফুটও দেখি না,' আপনমনেই বিড়বিড় করল বাবা। কুয়াশায় ভেজা উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করছে। দুই হাতে চেপে ধরেছে ড্রাইভিং হুইল।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে উঠল।

গ্যাস পেডালে বার বার ওঠানামা করতে শুরু করল পা'টা। ঝুলে পড়ল চোয়াল। টকটকে লাল হয়ে গেছে মুখ।

'বাবা! কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠলাম।

জবাব দিল না বাবা। পাগলের মত চাপ দিয়ে চলেছে গ্যাস পেডালে।

প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে গাড়ির। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ঝাঁকি খেতে খেতে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল তীব্র গতিতে।

'ব্রেক কাজ করছে না!' অবশেষে দুঃসংবাদটা জানাল বাবা।

## তিন

শুনে আঁতকে উঠলাম।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরাল বাবা।

গতির কারণে এক পাশে সরে দরজায় গিয়ে ধাক্কা খেলাম আমি।

পেছনে গোঁ-গোঁ করছে ফারিহা।

স্টিয়ারিংটা এমন লাফালাফি করছে, ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে বাবার। মনে হচ্ছে হাত থেকে ছুটে চলে যাবে।

আরেকটা জোরাল ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। গাড়ির হর্ন। কুয়াশার দেয়াল

ফুঁড়ে একটা কালো ভ্যান ছুটে এল আমাদের দিকে। চিৎকার করে উঠলাম তিনজনেই।

বন্‌বন্ স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে বাবা। কাঁপতে শুরু করল গাড়ি। পাশ দিয়ে চলে গেল ভ্যানটা।

নেমে চলেছি রাস্তা বেয়ে। দ্রুত। আরও দ্রুত।

নিচের দিকটায় ঢাল অনেক বেশি খাড়া। মরিয়া হয়ে একবার এপাশে, একবার ওপাশে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে বাবা। কুয়াশার মধ্যে প্রতিটি মোড় আর বাঁক চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করছে।

প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল। চিৎকার করে উঠলাম। সীট বেল্ট কেটে বসল কোমরে।

'মরব আজ! বাঁচব না কোনমতে!' ককিয়ে উঠল ফারিহা।

ব্রেকে ওঠানামা করেই চলেছে বাবার পা, পাম্প করছে যেন। চিৎকার করে উঠল পরক্ষণে।

ব্রেকটা আটকে গেছে। চাকাও ঘুরছে না এখন। পিছলে গেল চাকা।

টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ কানে এল।

আরেকটা গাড়ির হর্ন। একটা ধূসর গাড়ি আমাদের দিকে ছুটে আসতে দেখলাম।

রাস্তা থেকে পিছলে সরে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি। কালো অন্ধকার বনের দিকে। বড় বড় গাছ।

আবার ঘুরতে শুরু করল চাকা। বাবার ডান হাতটা সরে গেল নাচতে থাকা স্টিয়ারিং হুইল থেকে। ইমার্জেন্সি ব্রেকটা ধরে একটানে তুলে দিল।

চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

তীব্র গতিতে সামনে ছুটে গেল গাড়ি। প্রচণ্ড ঝাঁকি।

গুঁতো লাগিয়েছে গাছে। ধাতব শরীর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ার শব্দ। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল।

ড্যাশবোর্ডে বাড়ি খেল আমার মাথা। গাড়িটা আবার পিছিয়ে আসতে আমার মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

ফারিহার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল।

তারপর নীরবতা।

চোখ মেললাম। মিটমিট করলাম কয়েকবার। গাড়িটা যে থেমে গেছে বুঝতে সময় লাগল আমার।

গাছের সঙ্গে বাড়ি লেগেছে। উইন্ডশীল্ড বেঁকে গেছে। তার ওপাশে হুডটাকে আর চেনার উপায় নেই।

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল আমার। চাঁদিটা দপ্‌দপ্ করতে লাগল রক্তের চাপে।

'আমরা···বেঁচে আছি?' শোনা গেল বাবার ফিসফিসে কণ্ঠ। ঝাঁকি দিয়ে যেন পরিষ্কার করে নিতে চাইল মাথার ভেতরটা। পেছনে তাকাল, 'ফারিহা, তুমি ঠিক আছো?'

'আছি, খালু,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল ফারিহা।

'আমারও কিছু হয়নি,' ঢোক গিলে বললাম। মুখের ভেতরটা সিরিশ কাগজের মত খসখসে লাগছে।

'মাত্র গত সপ্তাহে মেরামত করিয়েছিলাম ব্রেকটা,' বিড়বিড় করল বাবা। হঠাৎ

বদলে গেল চেহারা। বড় বড় হয়ে উঠল চোখ। টানাটানি করে খুলে ফেলল সীট বেল্ট। ধাক্কা দিয়ে খুলল দরজা।

'বাবা?'

জবাব না দিয়ে টলতে টলতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বাবা। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হিঁক্ হিঁক্ শুরু করল। বমির তাড়নায় ভয়ানক ভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে দেহটা। ভয়ানক উত্তেজনার ধকল সইতে পারেনি শরীর। হড়হড় করে সব বেরিয়ে চলে এল পেট থেকে।

তার স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাবা ফিরে এলে বললাম, 'আরেকটা নতুন গাড়ি লাগবে আমাদের, তাই না, বাবা?'

*

পরদিন রোববার। সকালে খবরের কাগজ আসার আগেই ঘুম থেকে উঠে কাপড়-চোপড় পরে ফেললাম। কাগজ এলে, ঘরে নিয়ে এসে শুধু গাড়ির বিজ্ঞাপন দেয় যে পাতাটায় সেটা রেখে বাকি সমস্ত পাতাগুলো ছুঁড়ে ফেললাম একপাশে।

লিভিং রূমের মেঝেতে পাতাটা ছড়িয়ে বসে দাগ দিতে লাগলাম যে বিজ্ঞাপনগুলো পছন্দ হচ্ছে আমার সেগুলোর চারপাশ ঘিরে। সকাল সাড়ে আটটায় যখন নাস্তা খেতে এল বাবা, তখনও তার পরনে পায়জামা। আমি ততক্ষণে দেখানোর জন্যে রেডি হয়ে গেছি।

'এটা দেখো,' পাতাটা তার নাকের কাছে ঠেলে দিয়ে বললাম।

চোখ মিটমিট করল বাবা। আঙুল চালিয়ে সমান করে দিতে চাইল তারের মত কুঁকড়ে থাকা কালো চুলগুলো। 'মুসা, আমার চোখ থেকে ঘুমই যায়নি এখনও,' গুঙিয়ে উঠল বাবা। কাঁধ চুলকাল। 'অ্যাক্সিডেন্টের বেশ ভাল একটা ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তোর?'

'আমি ভাল। বিজ্ঞাপনটা দেখো,' অস্থির হয়ে বললাম।

'এক কাপ কফি খাওয়ার সময়ও দিবি না নাকি?' আবার গুঙিয়ে উঠল বাবা। 'চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি,' নাছোড়বান্দার মত বললাম।

বাবা কিছু বলার আগেই পড়তে শুরু করলাম, 'নতুন মডেলের স্পোর্টস সেডান, মালিক বদল হয়নি একবারও। ভি-৮, ভেতরটা সাদা চামড়ায় মোড়া, নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা সহ খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ ঠেকায় পড়ে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে মালিক। আপনি যা বলবেন তাতেই দিয়ে দেয়া হবে।'

চোখের পাতা সরু করে আমার দিকে তাকাল বাবা, 'এই শেষ লাইনটা কি পড়লি?'

'আপনি যা বলবেন তাতেই দিয়ে দেয়া হবে,' আবার পড়লাম।

'ইনটারেস্টিং!' বাবা বলল।

'এখনই যাব?' চিৎকার করে উঠলাম। 'এই যে, ফোন নম্বর আর ঠিকানাও দিয়েছে। থারটিনথ জুন স্ট্রীটে।'

'হুঁ, শহরের আরেক মাথায়,' আনমনে বলল বাবা।

'কিসের কথা বলছ তোমরা?' সিঁড়ির মাথা থেকে জিজ্ঞেস করল মা। গাউনের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'মুসা, এত সকালে বাইরে যাওয়ার কাপড় পরেছিস কেন?'

'বাবার সঙ্গে গাড়ি দেখতে যাব।' হেসে বাবাকে পক্ষে টানতে চাইলাম, 'তাই

না, বাবা?'

*

নাস্তার পর শহরে রওনা হলাম আমি আর বাবা। ফারিহারও আসার একান্ত ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মা আটকে দিয়েছে। রোববারে স্কুল ছুটি। ফারিহার গানের মাস্টার আসে।

সাদা একটা ফোর্ড টরাস চালাচ্ছে বাবা। আপাতত কাজ চালানোর জন্যে ভাড়া নিয়েছে। 'এ গাড়িটাও মন্দ না,' হেসে বলল বাবা। 'বেশ ভাল।'

'কিন্তু বাবা,' এটাই না রেখে দেয় বাবা তাই শঙ্কিত হয়ে বললাম, 'যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা এর চেয়ে অনেক ভাল।'

সাদা মেঘের আঁকাবাঁকা প্রান্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। পথের পাশের লম্বা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আলোর বর্শা। এখন উপত্যকা বেয়ে নামতে আর কোন অসুবিধেই হচ্ছে না আমাদের।

মসৃণ গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। রাস্তায় গাড়ির ভিড় কম। এমনকি ট্র্যাফিক আলোগুলোও বেশির ভাগ সময় সবুজ থাকছে যেন আমাদেরকে সুবিধে দেয়ার জন্যেই।

শহরটাও প্রায় নির্জন। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ রোববারের সকালে। প্রাণচাঞ্চল্য চোখে পড়ছে একমাত্র হাই স্কুলের পেছনের বড় মাঠটায়, যেখানে ফুটবল খেলার প্রস্তুতি চলছে, কলরব করছে ছেলেমেয়ের দল, কোচ আর অভিভাবকরা মিলে।

'ঠিকানাটা কি যেন?' তিনটে সাইকেলের পাশ কাটানোর সময় গতি কমাল বাবা। মাঠের দিকে চলেছে হেলমেট পরা তিনটে ছেলে-মেয়ে।

পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটা বের করে ঠিকানা পড়ে শোনালাম।

'এখান থেকে তিন-চার ব্লক দূরে।' সাদা রঙের একটা বর্গাকার ব্লকের কাছে এসে বাবা বলল, 'শোন্, গাড়িটা আমরা কেবল দেখতে এসেছি, কিনতে নয়। দেখামাত্র কিনে ফেলার কোন ইচ্ছেই নেই আমার। অতএব চাপাচাপি করবি না। বুঝেছিস?'

'যদি বেশি পছন্দ হয়ে যায়?'

'আমার ওপর দিয়ে কথা বলতে যাবি না,' গতি কমিয়ে ডাকবাক্সগুলোর নম্বর দেখতে দেখতে এগোল বাবা। 'আজ আমরা কিনতে আসিনি। শুধু দেখতে এসেছি।'

'কিন্তু যদি অতিরিক্ত ভাল হয়ে যায়?'

জবাব দিল না বাবা।

সাদা, ছোট একটা কাঠের বাড়ির খোয়া বিছানো পথে গাড়ি ঢোকাল। 'এই বাড়িটাই,' বিড়বিড় করল বাবা। 'গাড়িটা বোধহয় পেছনের গ্যারেজে রাখা আছে।'

ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় একটা বড় গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল বাবা। নেমে গিয়ে দরজায় টোকা দিল।

ভেতরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দিল লম্বা, হালকা-পাতলা এক ভদ্রলোক। গায়ে সুতীর ওভারঅল আর লাল-কালো ফ্লানেলের শার্ট। মাথা কাত করে ছোট ছোট নীল চোখ মেলে তাকাল আমাদের দিকে।

লোকটাকে দেখলে বাজপাখির কথা মনে পড়ে যায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চওড়া কপাল, গোলাকার মুখের ওপর মস্ত একটা বাঁকা নাক বসানো। নীল চোখের দৃষ্টি

দীর্ঘক্ষণ স্থির করে রাখল আমাদের ওপর।

অবশেষে নীরবতা ভাঙল বাবা, 'মিস্টার মেলভিল? একটু আগে আমিই ফোন করেছিলাম। গাড়িটার ব্যাপারে।'

আরেক দিকে মাথা কাত করল এবার মিস্টার মেলভিল। মাথা ঝাঁকাল। গলা পরিষ্কার করল। 'পেছনে আছে। গ্যারেজে।'

মাংস ভাজার সুগন্ধ ভেসে আসছে। ভেতরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার মেলভিল। দরজার এপাশে এসে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা।

'সুন্দর সকাল,' আনমনে বিড়বিড় করল সে। বাদামী চুলে ভরা মাথাটা চুলকাল। আমাদের পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। হাঁটতে শুরু করল গ্যারেজের দিকে।

'হ্যাঁ, বৃষ্টিভেজা সুন্দর সকাল,' বাবা বলল। আমাকে দেখাল, 'ও আমার ছেলে, মুসা। কাগজের বিজ্ঞাপনটা ওর চোখেই পড়েছে প্রথমে...'

দাঁড়িয়ে গেল মিস্টার মেলভিল। ফিরে তাকাল আমার দিকে। 'মুসা? গাড়ি খুব পছন্দ তোমার?'

মাথা ঝাঁকালাম। 'হ্যাঁ। গাড়ি আমার ভীষণ পছন্দ। গাড়ির মডেল বানাই। গাড়ির ছবি আঁকি...'

আমাকে কথা শেষ করতে দিল না মিস্টার মেলভিল। 'তাহলে এ গাড়িটা তোমার পছন্দ হবেই।'

তার পেছন পেছন ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। খোয়ায় হাঁটতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। গ্যারেজের কয়েক ফুট দূরে থেমে পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

'খাইছে!' আপনাআপনি বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। বাবার দিকে তাকালাম। 'দরজাটা দেখো,' আস্তে করে বললাম। 'এ ভাবে ডাণ্ডা লাগিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে কেন?'

## চার

'ডাণ্ডা?' শ্যেন দৃষ্টি আমার ওপর স্থির করল মিস্টার মেলভিল।

কান গরম হয়ে যাচ্ছে আমার। এত আস্তে বলেছি, তা-ও শুনে ফেলবে ভাবিনি।

'চোরের বড় যন্ত্রণা। গাড়িটাড়ি ভালমত তালা দিয়ে রাখতে হয়,' পকেট হাতড়ে চাবির গোছা বের করল মিস্টার মেলভিল। 'আশেপাশের লোকজন ভাল না মোটেও। গত সপ্তাহেই একটা গাড়ি চুরি হয়ে গেল আমাদের পাশের বাড়ি থেকে।'

কিন্তু তাই বলে এতগুলো ডাণ্ডা? গুনে দেখলাম, ছয়টা। মনে হলো সত্যি কথা বলছে না লোকটা।

ছয়টা তালা খুলতে অনন্ত কাল লাগিয়ে দিল যেন মিস্টার মেলভিল। অবশেষে গ্যারেজের দরজাটা যখন খোলার জন্যে চেপে ধরল সে, উত্তেজনায়

বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল আমার।

ওপরে উঠে গেল গ্যারেজের দরজা। রোদ পড়ল গাড়িটাতে। সোনার মত জ্বলে উঠল ক্রোমের বাম্পার। চকচক করে রোদ প্রতিফলিত করছে বাঁকানো ট্রাংকটা।

'খাইছে!' বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে।

পেছন থেকেও অপূর্ব লাগছে গাড়িটাকে!

'স্পোর্টস কারের ডিজাইন,' আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বলল মিস্টার মেলভিল। 'কিন্তু সীট আছে চারটা।'

তার হাতের চাবির গোছা নাড়া লেগে ঝনঝন করে উঠল। গোছাটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে। 'একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই কোথাও,' বাবাকে বলল। 'চলেছে মাত্র দশ হাজার মাইল। একটা গাড়ির জন্যে কিছু না।'

'অবিশ্বাস্য!' কোনমতেই আটকাতে পারছি না মুখটা।

আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল বাবা। চুপ থাকতে বলল।

আমি আর বাবা দু'জনেই ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করলাম গাড়িটা। মসৃণ ফেন্ডারগুলোয় হাত বুলালাম। বডির রঙ হালকা নীল, ভেতরের সব কিছু সাদা চামড়ায় মোড়া। ডিজাইনটা এমনই দেখে মনে হয় দাঁড়িয়ে থেকেও নব্বই মাইল গতিতে ছুটছে।

নতুন মডেলের করভেট গাড়ি। রাজকীয় চেহারা। চার সীট।

ডায়াল আর কন্ট্রোলগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলাম, 'কি সাংঘাতিক!'

না হেসে আর পারল না বাবা। মিস্টার মেলভিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসার পছন্দ হয়ে গেছে।'

খসখসে চুলে আঙুল চালাল মিস্টার মেলভিল। তার ঠোঁট দুটো পরস্পরের সঙ্গে চেপে থেকে ইংরেজি 'ও' অক্ষরের মত গোল হয়ে রইল। হাসল না।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল বাবা। 'গাড়িটার কোন গোলমাল আছে নাকি?' মিস্টার মেলভিলকে জিজ্ঞেস করল। 'বিক্রি করতে চান কেন?'

'কি গোলমাল থাকবে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করল মিস্টার মেলভিল। 'নাহ্, কোন গোলমাল নেই। আমি···আসলে আমি আর এটা ব্যবহার করতে চাই না। অন্য কিছু নয়।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। হাত দুটো কাঁপছে। তাড়াতাড়ি ওভারঅলের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

হাঁটু গেড়ে বসে চাকাগুলো পরীক্ষা করে দেখল বাবা। 'নতুনই তো লাগছে!' রূপালী হুইল কভারগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল।

'চালিয়ে দেখে আসতে চান?' জিজ্ঞেস করল মিস্টার মেলভিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' বাবা জবাব দেবার আগেই আমি চিৎকার করে উঠলাম।

আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল বাবা। মিস্টার মেলভিলের দিকে ঘুরল আবার। 'হ্যাঁ, চাই। চালিয়ে দেখান না আমাদের।'

'না না!' চমকে গেল যেন মিস্টার মেলভিল। পিছিয়ে গেল এক পা।

এত ভয় পাচ্ছে কেন? অবাক লাগছে আমার।

খুক করে কাশি দিয়ে আরেকবার গলা পরিষ্কার করল মিস্টার মেলভিল। পকেট হাতড়াতে লাগল চাবির জন্যে। 'না···আমি···বলছি কি, আপনি নিজেই গিয়ে চালিয়ে দেখে আসুন না।'

গাড়ির চাবি বের করে বাবার দিকে বাড়িয়ে ধরল। এখনও হাত কাঁপছে তার। 'নিন। আমি···আমি এখানেই আছি। দেখে আসুন চালিয়ে।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাবা। 'সত্যি আপনি আসবেন না সঙ্গে?'

বাবার হাতে চাবিটা গুঁজে দিল মিস্টার মেলভিল। 'না···আমার···আমার কাজ আছে···নাস্তাও করিনি এখনও।'

'ও, আমি দুঃখিত,' বাবা বলল। 'অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম···'

'না না, বিরক্ত না। গাড়িটা নিয়ে যান, ঘুরে আসুনগে,' মিস্টার মেলভিল বলল। 'আমি আছি। আপনি ফিরে এলে দামের ব্যাপারে কথা হবে। আমি···আমি জানি গাড়িটা আপনি নেবেন। এত সুন্দর গাড়ি!'

ঘুরে দাঁড়াল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

লোকটা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম আমি আর বাবা।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করলাম আমি।

প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে নরম গদিতে গা এলিয়ে দিলাম। 'আহ্, দারুণ! দারুণ!'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল বাবা। প্রথমে সীট অ্যাডজাস্ট করল। তারপর সাইড মিরর।

'ওই লোকটা এত ভয় পাচ্ছিল কেন?' বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'কি জানি!' কাঁধের ওপর দিয়ে সীট বেল্ট টেনে দিল বাবা। 'তার সমস্যাটা আমিও বুঝলাম না। যাকগে। ওকে ছাড়াই গাড়িটা টেস্ট করতে পারব আমরা। কি আর হবে, তাই না?'

ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল বাবা।

## পাঁচ

মুহূর্তে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

গ্যাস পেডালে চাপ দিল বাবা। ইঞ্জিনের ঝিরঝির শব্দটা গর্জনে রূপ নিল।

'ভালই তো,' বাবা বলল। 'খুব সুন্দর।' ডান হাতে গীয়ারশিফটটা ধরে ঠেলে দিল। গ্যারেজ থেকে স্বচ্ছন্দে খোয়া বিছানো পথে পিছিয়ে বেরিয়ে এল গাড়িটা।

সামনের জানালা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম মিস্টার মেলভিলকে। দুই হাত পকেটে ঢোকানো। পাথরের মূর্তির মত স্থির।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঘুরিয়ে গেটের দিকে রওনা দেয়ার আগে ভালমত ব্রেক পরীক্ষা করল বাবা। গতি বাড়িয়ে দিয়ে শাঁই করে ডানে কাটল আচমকা। নিখুঁত ভাবে ঘুরে গেল গাড়ির নাক। আবার গাড়ি সোজা করে গেট দিয়ে একটানে বেরিয়ে এল বাবা।

'সত্যি ভাল,' বাবা বলল। 'এমন করে চলছে, মনে হচ্ছে আমার চালানো লাগছে না, নিজেই নিজেকে চালাচ্ছে।'

'আর দরকার নেই দেখার, বাবা! কিনে ফেলো!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'আরে দাঁড়া না, অত পাগল হয়ে যাচ্ছিস কেন?' হেসে বলল বাবা। 'গাড়ি জিনিসটা অতি জরুরী এবং কাজের জিনিস। বার বার কেনা যায় না। দেখেশুনে কেনাই ভাল। দেখলাম, ভাল লেগে গেল আর কিনে ফেললাম, সেটা করা ঠিক না। তা ছাড়া এটা কেনার সাধ্য আছে কিনা আমাদের তা-ও তো দেখতে হবে। বিশ-তিরিশ হাজার ডলারের কম হবে না দাম।'

'কিন্তু কাগজে বিজ্ঞাপনে বলেছে···' বলতে গেলাম।

'ওটা একটা কথার কথা, খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্যে,' বাবা বলল। 'আমি যদি দু'টাকা বলি তাতে কি আর দেবে?···এটা একটা সত্যিকারের লাক্শরি কার, মুসা। গাড়ি তো তুই আমার চেয়ে ভাল চিনিস। ভাল করেই বুঝতে পারছিস আমাদের বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি দাম এটার।'

মসৃণ সীটটায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'সত্যি, সাংঘাতিক জিনিস!'

রেডিও অন করে দিল বাবা। মুহূর্তে চারটে স্পীকার থেকে বাজনা যেন ঘিরে ফেলল আমাদের। সিগন্যাল লাইট, হেডলাইট, হীটার, এয়ার কন্ডিশনার, সব পরীক্ষা করে দেখল বাবা।

'সবই তো নিখুঁত,' ফিরে চলল বাবা। 'বুঝতে পারছি না এত চমৎকার একটা গাড়ি কেন বিক্রি করে দিতে চাইছে মিস্টার মেলভিল?'

'আর আমি ভাবছি, আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল না কেন?'

আবার খোয়া বিছানো পথটায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল বাবা। বাড়ির একপাশে এনে রাখল। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

'দামটা জিজ্ঞেস করেই দেখো না,' আমি বললাম। 'জিজ্ঞেস করতে তো আর দোষ নেই, নাকি?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বাবা। 'ঠিক আছে, করব। তবে আগেই ধরে রাখ, হবে না। এটা কেনা আমার সাধ্যের বাইরে এখন।'

ঠেলে দরজা খুলে নিচে নামলাম। আরেকটু হলে ধাক্কা লাগত মিস্টার মেলভিলের সঙ্গে। 'ওহ্, সরি!' তাড়াতাড়ি বললাম।

হালকা নীল শ্যেন-দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল মিস্টার মেলভিল। কিছু বলল না। পেছনের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল।

ঘামছে কেন? এটাও আমার অবাক লাগল। বাইরে আজ বেশ ঠাণ্ডা। নিঃশ্বাসের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি।

'ফিরে তাহলে এলেন,' অবশেষে বলল মিস্টার মেলভিল, বাবাকে দেখতে দেখতে।

আমাদের দেখে অত স্বস্তি বোধই বা করছে কেন? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। গাড়িটা নিয়ে পালিয়ে যাব ভয় করছিল নাকি?

'খুব ভাল গাড়ি,' চকচকে নীল ছাতটায় চাপড় দিল বাবা। 'সুন্দর চলে।'

মাথা ঝাঁকাল মিস্টার মেলভিল। 'আপনার পছন্দ হয়েছে? ফ্যামিলি কার হিসেবে ভাল বলছেন? আপনার স্ত্রী কি গাড়ি চালাতে পারে?'

'পারে,' বাবা বলল। 'আমার তো মনে হয় সে···'

'আমিও চালাতে পারি,' বাধা দিয়ে বললাম। 'অ্যারিজোনার মরুভূমিতে গিয়ে আমাকে চালাতে দিয়েছিল একবার বাবা।'

ভেবেছিলাম শুনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে মিস্টার মেলভিল। কিন্তু

আমাকে অবাক করে দিয়ে চিবুক কেঁপে উঠল তার। চোখে পানি জমতে দেখলাম।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রুমালের মধ্যে নাক ঝাড়ল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'ঠাণ্ডাটা যে আবার কি করে লাগল!'

'ইয়ে, গাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে,' এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকাল বাবা। 'কিন্তু আমরা আরও কম দামী একটা···'

'কম দামেই দিয়ে দেব আপনাদেরকে,' মিস্টার মেলভিল বলল। চোখের পাতা সরু করে তাকাল গাড়িটার দিকে। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। 'এটার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই আমি।'

কি জানি কেন, তার বলার ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল আমার।

গাড়িটার কাছ থেকে সরে গেল বাবা। 'কিন্তু কত আর কম···'

'পাঁচ হাজার ডলার কি বেশি হয়ে যাবে আপনার জন্যে?' মিস্টার মেলভিল জিজ্ঞেস করল।

ঢোক গিলল বাবা। 'পাঁচ হাজার? প্রথম কিস্তি?'

'না, পাঁচ হাজারই দাম,' জবাব দিল মিস্টার মেলভিল। 'ব্যবহার করা গাড়ি। যতই নতুন থাকুক, পুরো দাম আর কে দেবে। পাঁচ হাজার ডলার দিলে আপনার কাছে বেচে দেব।'

'বাবা···' তার আস্তিন ধরে টান মারলাম। 'কিনে ফেলো!'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, দুই হাত শূন্যে তুলে লাফাতে ইচ্ছে করছে আমার।

বহু কষ্টে নিজেকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে রাখলাম।

'বেশ···' চোয়াল ডলল বাবা, ভেবে দেখার ভান করছে। কিন্তু তার চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলতে দেখছি আমি। আমি জানি, 'হ্যাঁ' না বলে পারবে না।

'আপনি সত্যি বলছেন, গাড়িটাতে সত্যি কোন গোলমাল নেই, মিস্টার মেলভিল?' বাবা জিজ্ঞেস করল।

'গোলমাল?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা কাত করল মিস্টার মেলভিল। 'না। কোন গোলমাল নেই। গাড়িটাতে অন্তত কোন গণ্ডগোল নেই।'

'তাহলে কোথায় আছে?'

প্রশ্নের জবাব দিল না মিস্টার মেলভিল। চোখ দুটো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যেতে দেখলাম। কালো হয়ে গেল চেহারা। যেন মেঘের ছায়া পড়ল। 'কিন্তু যদি কেনেনই, একটা শর্ত আছে আমার।'

'কি শর্ত?'

## ছয়

গাড়িটার দিকে চোখ ফেরাল মিস্টার মেলভিল। 'আজকেই এটা এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।'

আমার দিকে তাকাল বাবা।

অদ্ভুত শর্ত, মনে হলো আমার। বাবা রাজি হয়ে যাবে, বোঝাই যাচ্ছে।

'রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র আর বিক্রির রশিদ সব ঠিকঠাক আছে,' ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে মাথা ঝাঁকাল মিস্টার মেলভিল। 'রেডি করেই রেখেছি আমি। চেকবুক কি নিয়ে এসেছেন? তাহলে এখনই আপনাকে কাগজপত্র দিয়ে দিই?'

'দেবেন?' দ্বিধা করছে বাবা। আমার চোখে চোখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। চোখ ফেরাল আবার গাড়িটার দিকে। 'দিন!'

আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না নিজেকে। 'ইয়াহু!' বলে এক চিৎকার দিয়ে শূন্যে দিলাম লাফ।

মিস্টার মেলভিলের সঙ্গে ঘরের দিকে পা বাড়াল বাবা। কিন্তু হাত নেড়ে থামিয়ে দিল মিস্টার মেলভিল। 'আমি নিয়ে আসছি। আপনার আর কষ্ট করে আসার দরকার নেই।'

দ্রুত গিয়ে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

'আজব লোক,' বিড়বিড় করে বলল বাবা। 'আমাকে ঘরে ঢুকতে দিল না কেন?'

এতই উত্তেজিত হলাম, মনে হলো ফেটে যাব। 'বাবা! এটা আমাদের! গাড়িটা এখন আমাদের! আমি ভাবতে পারছি না!'

মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না কোনমতে। কিছু একটা করা দরকার। নইলে সত্যি ফেটে যাব!

দুই হাত মাথার ওপর তুলে ঘাসের ওপর ডিগবাজি খাওয়া শুরু করলাম। প্রথমবার পারলাম। দ্বিতীয়বারে ফসকাল হাত। ধড়াস করে পড়ে গেলাম চিৎ হয়ে।

ব্যথা পেয়ে 'আউ' করে উঠলাম। কিন্তু মুখে হাসি। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে থেকেই হা-হা করে হাসতে শুরু করলাম।

বাবাও হাসছে। 'ডিগবাজি তো আমারও খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বড় হয়ে গেছি অনেক। এখন আর ডিগবাজি খাওয়ার সময় নেই আমার।'

এগিয়ে এসে আমাকে টেনে তুলল বাবা। 'ওঠ্। কাজের কাজ করেছি আজকে একটা আমরা।' হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে। 'সত্যি, ভাবা যায় না!'

*

রাতের বেলা খেতে বসে তরকারির বাটি থেকে ঝোল ফেলে দিলাম। হাতের নাড়া লেগে পানি ভর্তি গ্লাসটা কাত হয়ে পড়ে গেল। গাড়িটা আমাকে এতটাই উত্তেজিত করে ফেলেছে, কোনমতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না।

'বাবা, খাওয়ার পর কি ঘুরতে বেরোব?' জিজ্ঞেস করলাম।

'এই, মুখ মোছ্,' ধমক দিয়ে বলল মা। 'খাওয়ার সময় এত মুখে লাগে কি করে?'

'বাবা, যাব?' ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'বিকেলেই তো এত ঘোরা ঘুরে এলাম,' বাবা জবাব দিল। 'রাতে আর পারব না, কাজ আছে। বুঝলাম, গাড়িটা তোর ভীষণ পছন্দ। কিন্তু তাই বলে সারাক্ষণ ওটার ভেতরে বসে থাকতে হবে নাকি।'

'ও আসলে গাড়িটার মধ্যে বাস করতে চায়!' ফোড়ন কাটল ফারিহা। মুচকি হাসল।

'হ্যাঁ, চাই,' রেগে উঠে বললাম। 'তাতে ক্ষতিটা কি?'

হাসিটা বন্ধ হলো না ফারিহার। 'বাথরুম সারবে কোথায়?'

বাবাও হেসে উঠল।

'এতে অত হাসির কি হলো?' ফারিহার দিকে তাকাল মা, 'ফারিহা, এ সব নোংরা কথা শিখলি কবে থেকে? এটা খাবার টেবিল, ভুলে গেছিস?'

'বাবা, ইকটুখানি ঘুরে এলে কেমন হয়?' আবার আগের প্রসঙ্গ টানলাম আমি। 'পাহাড় থেকে নেমে কেবল শহরে যাব, আর আসব?'

'না! হোমওঅর্ক আছে না তোর?' ধমকে উঠল মা। 'কাল যে স্কুল খোলা, তা-ও ভুলে গেছিস নাকি?'

জবাব দিতে না পেরে টান দিয়ে একটা গোল রুটির অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে সবটাই মুখে পুরে দিলাম।

'নতুন গাড়ি কেনাতে সবাই উত্তেজিত আমরা, বুঝলাম,' স্যুপের বাটিটা বাবার দিকে ঠেলে দিল মা। 'কিন্তু তাই বলে পাগল হয়ে যেতে হবে নাকি। গাড়িটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। থাকবে বহুকাল। হাজার বার চড়া যাবে ওটাতে।'

'গিয়ে তাহলে একটু বসে আসি খালি?' হাল ছাড়তে রাজি নই আমি কোনমতেই। 'হুইলের পেছনে বসব। রেডিওটা চালাব। হেডলাইট জ্বালব। ব্যস।'

'না, ব্যস না!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মা। 'হোমওঅর্ক। গাড়ি বাদ। একেবারে বাদ।'

আর তর্ক করলাম না। মা'র এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। যা করতে বলছে তাই করতে হবে এখন। কোন কথা বলেই আর ভজানো যাবে না।

খেতে খেতে সবাই কথা বলছে। কিন্তু সেগুলো আমার কানে ঢুকছে না আর। নতুন গাড়িটার কথা ভেবেই চলেছি আমি। ওটার চমৎকার নীল রঙ। নরম চামড়ার সীট। ইঞ্জিনের মোলায়েম ঝিরঝির শব্দ···

ঘরে এসে হোমওঅর্ক করতে বসলাম। কিন্তু বার বার উঠে উঠে জানালার কাছে গিয়ে, জানালা দিয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে গাড়িটা দেখাই সার হলো। ড্রাইভওয়েতে পার্ক করে রেখেছে বাবা। আমার ঘর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

রাস্তার লাইটপোস্ট থেকে হলুদ আলো এসে পড়েছে গাড়িটার ওপর। ক্রোমের বাম্পারগুলো জ্বলছে তাতে। বডির হালকা নীল রঙটাকে লাগছে চাঁদের আলোর মত।

নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

গাড়ির মধ্যে বসতেই হবে একবার।

পা টিপে টিপে হলওয়েতে বেরিয়ে এলাম। ভাল করে দেখে নিলাম আশেপাশে ফারিহা আছে নাকি। ও অবশ্য কোন ঝামেলা বাধাবে বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই।

বিচিত্র সব শব্দ ভেসে আসছে তার ঘর থেকে। তারমানে কম্পিউটারে গেম খেলছে।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। দেয়াল ঘেঁষে রইলাম এমন করে যাতে সিঁড়িতে চাপ কম পড়ে, শব্দ না হয়। ফোনে কথা বলতে শুনলাম মা'কে।

সিঁড়ির গোড়ায় নেমে থামলাম। বাবা কোথায়?

'আঁউ!' পেছনের হল থেকে ভেসে এল তার চিৎকার। পুরো আধপাক ঘুরে গেলাম দেখার জন্যে। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে বাবা। চারপাশে যন্ত্রপাতি ছড়ানো।

একটা বিদ্যুতের তার পড়ে আছে পায়ের কাছে। বুঝলাম, শক্ খেয়েছে।

তারটা তুলতেই একটা চড়চড় শব্দ শোনা গেল। আবার 'আউক' করে উঠল বাবা। তারটা ছেড়ে দিয়ে হাত ঝাড়তে শুরু করল।

তারটাতে সমস্যা আছে। গোলমালটা কোথায় ধরতে পারছে না নিশ্চয় বাবা।

ঘুরে দাঁড়ালাম আবার। দম বন্ধ করে পা টিপে টিপে সামনের দরজার দিকে এগোলাম। বেরিয়ে এলাম বাইরে। জোরাল, ঠাণ্ডা বাতাস লাগল গায়ে। কালো মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে এক ফালি ফ্যাকাশে চাঁদ।

শীতে কেঁপে উঠলাম। ঘরে গিয়ে কোট আনার সুযোগ নেই আর। বাবার চোখে পড়ে যেতে পারি। আশা করলাম গাড়ির মধ্যে নিশ্চয় অত ঠাণ্ডা নেই।

ড্রাইভওয়ে ধরে দৌড়ে চললাম।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। ড্রাইভারের পাশের দরজার ক্রোমের হ্যান্ডেলটা চেপে ধরলাম।

'এসো,' ফিসফিস করে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'উঠে পড়ো!'

# সাত

'কে? কে কথা বলে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব নেই।

ঘুরে দাঁড়ালাম। 'কে? ফারিহা নাকি?'

না। কেউ তো নেই আমার পেছনে। ড্রাইভওয়েতে কোন লোকই নেই।

দ্রুত চলে এলাম প্যাসেঞ্জার সাইডে। নাহ্। এ পাশেও কেউ লুকিয়ে নেই।

ফিরে চললাম ড্রাইভারের দরজার দিকে। আবার শোনা গেল ফিসফিসে কণ্ঠ, 'এসো। ওঠো। চলো ঘুরে আসি।'

দরজার হ্যান্ডেলে হাত রেখে দ্বিধা করতে লাগলাম। মাথা নিচু করে সামনের সীটের দিকে তাকালাম।

'অ্যাই, কেউ আছো?'

সাড়া দিল না। কেউ নেই।

সব আমার কল্পনা, ভাবলাম।

টান দিয়ে দরজাটা খুললাম। এত সহজেই খুলে গেল, মনে হলো টানই দেয়া লাগল না আমার। আপনাআপনি জ্বলে উঠল ছাতের আলো। উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন সাদা চামড়ার সীটগুলো থেকে।

আস্তে করে নিজেকে নামিয়ে আনলাম সীটের ওপর, হুইলের পেছনে। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলাম দরজাটা। আলো জ্বেলে রাখতে চাই না। ঘর থেকে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে।

আরাম করে সীটে বসে স্টিয়ারিং হুইলে হাত বোলাতে লাগলাম আমি। ঠাণ্ডা। মসৃণ অনুভূতি।

গীয়ারশিফটটা চেপে ধরলাম। পার্ক থেকে নিউট্রালে দিলাম, নিউট্রাল থেকে পার্ক।

হুইলের ওপর ঝুঁকে ড্রাইভ করার ভঙ্গি করলাম। সিগন্যালের বোতাম টিপে দিয়ে আবার গীয়ার বদল করলাম।

রেস কারের ড্রাইভার কল্পনা করলাম নিজেকে। বিপজ্জনক মোড় নিতে প্রস্তুত। আর সব গাড়ির পাশ কাটিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি সামনে। গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ দিলাম।

চালাও, মুসা! আরও জোরে!

ছুটতে থাকো!

আবার গীয়ার বদল। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরানো।

সামনে তীক্ষ্ণ মোড়। চাকার ঘর্ষণ। পিছলে সরে যাওয়া। হাত থেকে স্টিয়ারিং ছুটে যাওয়ার অবস্থা।

ফার্স্ট হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়, এই সময় বেরসিকের মত জ্বলে উঠল বারান্দার আলো।

দম বন্ধ করে ফেললাম। স্টিয়ারিঙে শক্ত হয়ে গেল আঙুল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সদর দরজার মাথার আলোটা জ্বলে উঠেছে।

কে জ্বালল? বাবা? মা? আমাকে খুঁজতে আসছে নাকি?

পালানো দরকার।

হাতল ধরে টান মারলাম।

দরজা খুলল না।

আবার টান দিয়ে ধরে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলাম দরজায়।

নড়লও না।

তালা। দরজায় তালা লেগে গেছে নিশ্চয়।

ঘুরে বসে ছোট্ট নবটা খুঁজতে লাগলাম, যেটা দিয়ে দরজার তালা খোলে।

নব নেই।

লক কন্ট্রোলটা যেখানে থাকার কথা সেখানটায় হাত বোলালাম।

কি করে লাগালাম তালাটা? আপনাআপনি লেগে যায় নাকি?

দরজা খোলার মত কোন কিছু খুঁজে পেলাম না। আবার চেপে ধরলাম হাতল। চেপেচুপে নিচে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না।

তোলার চেষ্টা করলাম আবার। হ্যাঁচকা টান দিতে লাগলাম। একই সঙ্গে গায়ের জোরে ঠেলতে থাকলাম দরজায়।

নাহ্। খুলল না।

'অ্যাই! কি করে বেরোব আমি?' চিৎকার করে উঠলাম।

উইন্ডো কন্ট্রোল ধরে চাপাচাপি শুরু করলাম। নামানোর চেষ্টা করতে লাগলাম জানালাগুলো।

কিন্তু বিদ্যুতে চলে। ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় ওগুলো কাজ করবে না।

'অ্যাই!'

হাতল ধরে টানাটানি করে দেখলাম আরেকবার। দরজায় ধাক্কা দিলাম। দুই হাতে ধরে ঠেলাঠেলি করলাম।

কোনই লাভ হলো না। আটকা পড়েছি আমি! আটকা পড়েছি!

দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। কোন ধরনের একটা লক কন্ট্রোলের জন্যে

আবার হাতড়াতে শুরু করলাম।

থেমে গেলাম হাসি শুনে।

মৃদু হাসি। মেয়ে কণ্ঠের।

'এই! কে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলাম।

চলতেই থাকল হাসিটা। শীতল হাসি।

'কে হাসে?'

কে যেন এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে। ড্রাইভারের পাশের জানালাটার দিকে তাকালাম। অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা মুখ।

## আট

একটা মেয়ে।

মাথা ভর্তি এলোমেলো সোনালি চুল। রাস্তার আলোয় ঝিলমিল করছে। বিড়ালের চোখের মত চোখ। এমন করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে যেন আমি একটা ভূত!

'টান দাও দরজাটায়!' বার বার হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম ওকে। 'আটকে গেছে!'

মাথা ঝাঁকাল সে। হাতল চেপে ধরল।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দরজা।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমি। আমাকে বেরোতে দেখে সরে গেল সে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছি আমি।

মৃদু, ফিসফিসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'তুমি ওখানে কি করছিলে?'

'আমি···তালাটা আটকে গিয়েছিল,' ঘেমে যাওয়া চাঁদিতে হাত বোলাতে লাগলাম।

গায়ে একটা নীল সোয়েটার ওর। পরনে জিনস। এক হাঁটুর কাছে ছেঁড়া। কাঁধের ওপর ঝুলে থাকা চুলগুলো ঝাঁকি দিয়ে পেছনে সরাতে দেখা গেল কানে পাথর বসানো দুল।

'গাড়িটা নতুন,' ওকে বললাম। 'আজ সকালেই কিনেছি।'

মাথা ঝাঁকাল সে। হাসি ছড়িয়ে গেল মুখে। হাসলে গালে টোল পরে।

মেয়েটা সুন্দরী। মডেল কিংবা টিভি স্টার হতে পারবে অনায়াসে।

'বেরোনোর চেষ্টা করছিলে?' আদর পেলে বিড়াল যেমন গর্‌গর্‌ করে, তেমনি শব্দ বেরোল তার গলা দিয়ে। 'আটকে গিয়েছিলে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালাম। 'হ্যাঁ।···গাড়ি আমার খুব পছন্দ। সে-জন্যেই রাতের বেলা চড়তে এসেছি।'

ফেন্ডারে হাত রাখল সে। নখে চকচকে নীল রঙ লাগিয়েছে। বাঁ হাতের মধ্যমায় আঙটি। কানের দুলের পাথর আর আংটির পাথরের রঙ এক।

মেয়েটা বলল, 'আমি এসে ভালই করেছি, তাই না?'

'তা তো করেছই। দরজা খুলে দিয়ে সাহায্য করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

হাসল সে। 'আমার নাম টিনা কুপার।'

'আমি মুসা আমান।'

'জায়গাটা আমার জন্যে নতুন,' গাড়ির ফেন্ডারে এমন করে হাত বোলাতে লাগল যেন আদর করছে। 'হাঁটতে বেরিয়েছি। ঘুরে দেখছি কেমন জায়গায় এলাম।'

'কোন বাড়িতে উঠলে?'

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল সে। মোড়ের কাছের ফ্র্যাঙ্কলিনদের পুরানো বাড়িটা।

ওখানে? অবাক হলাম। বহুকাল কেউ থাকে না ওখানে।

'ভর্তি হলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম। 'রকি বীচ মিডল স্কুলে?'

'হব হয়তো,' মুখটাকে কেমন করল সে। 'এখনও জানি না। বছর শুরু হয়ে গেছে। এখন আর নতুন কোন স্কুলে ভর্তি হতে ভাল লাগবে না আমার।'

'এর আগে কোথায় ছিলে?'

'ছিলাম এক জায়গায়,' বলে হাসতে শুরু করল সে।

'না, ইয়ার্কি না,' বললাম। 'কোন্‌খান থেকে এলে তোমরা···'

কথা শেষ হলো না আমার। পেছন থেকে গায়ের ওপর এসে পড়ল কে যেন। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখি ফারিহা। হোঁচট খেয়ে আমার গায়ের ওপর পড়েছে।

'এখানে কি?' কিছুটা ধমকের সুরেই জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি এত রাতে বেরিয়েছ কেন?' আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল ফারিহা। 'গাড়িতে বসার জন্যে? আমিও বসব।'

ওর হাত চেপে ধরলাম। 'না, যেও না। বিপদে পড়বে। আমিও পড়েছিলাম।'

'কিসের বিপদ?'

'দরজার তালায় কোন সমস্যা আছে। আপনাআপনি লেগে যায়। তারপর আর খুলতে চায় না।'

'সত্যি বলছ?' বিশ্বাস করতে চাইল না ফারিহা।

'হ্যাঁ। আমি ঢুকে আটকা পড়েছিলাম। টিনা না এলে বেরোতেই পারতাম না। সারারাত গাড়িতে আটকে থাকতে হতো।'

'কে না এলে?' ফারিহা জিজ্ঞেস করল।

'টিনা।'

টিনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

নেই ও। চলে গেছে।

'কই? কার কথা বলছ? কাউকে তো দেখছি না,' ফারিহা বলল।

'আরে আস্তে বলো না!' দরজার দিকে তাকালাম। মা দেখে ফেললে আস্ত রাখবে না এখন।

ফারিহার গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছ?'

'একটা মেয়ে। ও-ই তো দরজাটা খুলে দিয়ে আমাকে বেরোতে সাহায্য করল।'

'তাহলে কোথায় গেল সে?'

চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললাম, 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

সামনের দরজার দিকে এগোলাম দু'জনে। সাবধানে পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

বাবা, মা কাউকে দেখলাম না।

পাশের ঘর থেকে টিভির শব্দ আসছে। নিজেদের ঘরে পালানোর এটাই সুযোগ।

'জলদি!' ফিসফিস করে বললাম ফারিহাকে।

আস্তে করে পাল্লাটা লাগিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। সিঁড়ির গোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছি, হঠাৎ পেছনের হলওয়ে থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

চোখের পলকে ঘুরে দৌড় মারলাম সেদিকে। মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল একটা সাদা আলোর ঝিলিক।

আলোর ভেতর থেকে টলতে টলতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল একটা মূর্তি। দুই হাত শূন্যে তোলা।

'ওই যে!' চিৎকার করে উঠল ফারিহা।

## নয়

আবার চিৎকার করে উঠল মূর্তিটা। আতঙ্কিত চিৎকার।

চড়চড় করতে থাকা সাদা আলো ঘিরে রেখেছে তাকে। টলতে টলতে এগোনোর চেষ্টা করল আমাদের দিকে। গুঙিয়ে উঠল।

চিৎকার করে উঠলাম। 'বাবা!'

বাবার এক হাতে ইলেকট্রিকের তারটা ধরা। বাহুটা বার বার ঝাঁকি দিয়ে ওঠানামা করছে ওপরে-নিচে। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে।

'কারেন্টে ধরেছে!' আবার চিৎকার করে উঠলাম।

প্রায় ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়লাম হলের ভেতরে। মেঝেতে পড়ে থাকা একজোড়া রবারের দস্তানা দেখতে পেলাম। বাবার কাজের জিনিস।

সাদা আলোর স্ফুলিঙ্গ নাচছে তাকে ঘিরে। চড়চড় করছে।

ছোঁ মেরে একটা দস্তানা তুলে নিয়ে টেনে ঢুকিয়ে দিলাম আঙুলের ওপর দিয়ে। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লাম দেয়ালের কাছে। তারের আরেকটা মাথা দেখতে পেলাম।

হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এলাম তারটা।

সব কিছু নীরব হয়ে গেল হঠাৎ। ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল বাবা।

গুঙিয়ে উঠল।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর রেখে চারপেয়ে জন্তুর মত উপুড় হয়ে রয়েছে বাবা। চুলগুলো এখনও খাড়া। মুখটা ছাই হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো মরা মানুষের মত।

'বাবা!' রবারের দস্তানাটা হাত থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ছুটে গেলাম তার কাছে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে ফারিহা। থরথর করে কাঁপছে। দৃশ্যটা

ভীষণ ভাবে চমকে দিয়েছে ওকে।

বাবার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। দুর্বোধ্য দু'একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এল কেবল।

'বাবা? তুমি ঠিক আছো?'

বাতাসে পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে। হুড়মুড় করে হলে ঢুকল মা। বাবাকে ওভাবে হুমড়ি খেয়ে থাকতে দেখে চোখ কপালে উঠল। 'কি হয়েছে তোমার? অ্যাঁ! কি হয়েছে?'

বড় করে দম নিল বাবা। খাড়া হয়ে বসল মেঝেতে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তারটা ঠিকমত লাগছিল না। লাগাতে গেলাম···তারের মাথা থেকে যে রবার কেটে ফেলেছি, মনে ছিল না···'

*

সে-রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমি। দুঃস্বপ্ন। নতুন গাড়িটাকে নিয়ে।

দেখলাম, গাড়িটাকে চালাচ্ছি আমি। উল্টো দিক থেকে আরেকটা গাড়ি ছুটে আসতে লাগল। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে টিনা। হেডলাইটের আলো পড়ল আমার চোখে। সোজা ছুটে এল আমার দিকে। হুইল ঘুরিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। সরল না গাড়িটা। বেরোনোর চেষ্টা করলাম। দরজা খুলতে পারলাম না। প্রচণ্ড জোরে এসে আমার গাড়িটাকে গুঁতো মারল টিনার গাড়ি।

মারা যাচ্ছি আমি!

চমকে জেগে গেলাম। ঘামে নেয়ে গেছে সারা শরীর।

পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কম্বলটা। গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে শার্টের কলার। চাপ লাগছে। দম নিতে পারছি না তাই।

উঠে বসলাম। সারা শরীর কাঁপছে।

চোখে লেগে রয়েছে এখনও হেডলাইটের সাদা আলো। চোখ মিটমিট করে আলোটা সরাতে চাইলাম।

ধীরে ধীরে কেটে গেল স্বপ্নের রেশ। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি ঘরে ঢুকেছে ভোরের কমলা রোদ।

'বাপরে বাপ!' মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, 'কি একখান স্বপ্ন!'

ঘাড়ের ঠাণ্ডা ঘাম মুছতে মুছতে বিছানা থেকে নেমে এলাম। পা কাঁপছে। দুর্বল লাগছে।

নাস্তার টেবিলে স্বপ্নের কথাটা ফারিহাকে জানালাম। মনের ভার নামানোর জন্যে কাউকে না কাউকে বলা দরকার।

'টিনাটা কে?' খাবার চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'কেন, ভুলে গেছ?' রেগে উঠলাম। 'সেই মেয়েটা, কাল রাতে যে আমাকে গাড়ি থেকে বেরোতে সাহায্য করেছিল।'

'কোন মেয়েকে কিন্তু দেখিনি আমি,' ফারিহা জবাব দিল।

'তাতে কি? আমি যে বললাম, বিশ্বাস হলো না?'

চামচটা নামিয়ে রেখে চোখ সরু করে আমার দিকে তাকাল ফারিহা। 'আচ্ছা, স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়?'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়লাম। 'কি করে হবে? বাস্তবে তো আর এখন গাড়ি চালাতে পারব না আমি। ড্রাইভিং লাইসেন্সই পাব না। বয়েস হয়নি।'

'এমন হতে পারে, আগে থেকেই সাবধান করে দিয়ে গেল হয়তো,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার চামচটা তুলে নিল ফারিহা।

'কিসের সাবধান?' ভুরু নাচালাম। স্বপ্নের কথাটা ওকে বলেই ভুল করেছি। ইয়ার্কি মারছে এখন।

চামচ দিয়ে খাবার খুঁটতে লাগল সে। কি যেন ভাবল। মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্বপ্নে মারা গেলে কি হয়, বলো তো?'

প্রশ্নটা চমকে দিল আমাকে। টেবিলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কি বোঝাতে চাইছে?

'স্বপ্নে যদি অ্যাক্সিডেন্ট করো?' প্রশ্ন করল ফারিহা। 'সত্যি যদি মেয়েটার গাড়ির সঙ্গে তোমার গাড়ির ধাক্কা লাগে? যদি মারা যাও? বাস্তবেও কি মারা যাবে তাহলে?'

প্রশ্নটা বেশ ভাল রকম একটা ধাক্কা দিল আমাকে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ভাবনায় পড়ে গেলাম। স্বপ্নে মরলে কি কেউ মরে? কি জানি! নিশ্চিত হতে পারলাম না। অন্যে না মরুক, আমি মরে যেতেও তো পারি। পৃথিবীতে কত উদ্ভট ঘটনাই ঘটে!

মাথা নাড়লাম। 'উঁহু। আমার তা মনে হয় না। স্বপ্ন একটা অবাস্তব ব্যাপার, তাই না? স্বপ্নে নিজেকে মরতে দেখলে মরবে না তুমি। আমার অন্তত সে-রকমই ধারণা।'

গম্ভীর ভাবটা ত্যাগ করে হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল ফারিহা। ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিল আমাকে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'ফারিহা, তোমাকে বলে একটা মহা অন্যায় করে ফেলেছি আমি! নিজেকে জুতো মারতে ইচ্ছে করছে এখন!'

'ঠিক আছে, আর খেপাব না। খাও,' চামচ দিয়ে ডিমের প্লেটে খোঁচা মারল ফারিহা।

তবে ঠাট্টা করে বললেও আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সে। সত্যিই তো। স্বপ্নটা যদি একটা ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে? সত্যি যদি গাড়ি চালাতে গিয়ে মারা যাই আমি?

গাড়িটার কথা ভাবলাম। ঘুম থেকে উঠেছি এক ঘণ্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে, এখনও একবারও দেখতে যাইনি ওটাকে।

তাড়াহুড়া করে এগিয়ে গেলাম সামনের দরজার দিকে।

বাইরে উজ্জ্বল রোদ।

গাড়িটা নেই।

'মা! মা!' বলে চিৎকার শুরু করলাম।

## দশ

'কি হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন?'

লিভিং রুম থেকে কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘরে ঢুকল মা।

ড্রাইভওয়ের দিকে হাত তুলে দেখালাম, 'গাড়িটা নেই...'

'তোর বাবা নিয়ে গেছে,' মা জানাল। 'জরুরী কাজ আছে, তাই ভোরবেলাতেই বেরিয়ে গেছে। পাশের বাড়ির মিসেস হ্যামিলটন বলেছেন, তোদের স্কুলে দিয়ে আসবেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও হতাশ হলাম ঠিকই।

এত ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখার পরেও গাড়িটাতে চড়ার ইচ্ছে বিন্দুমাত্র কমেনি আমার। চড়ে দেখতে চেয়েছিলাম সত্যি কোন অঘটন ঘটে কিনা। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের দেখিয়ে বাহবা পেতে চেয়েছিলাম।

সারাটা দিনই গাড়িটার কথা ভাবলাম আমি। টিচার কি পড়ালেন, কিছুই কানে ঢুকল না আমার। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে কথা যা বললাম, সবই গাড়িটাকে নিয়ে। এ রকম একটা গাড়ি এত কমে পেয়ে যাওয়ায় অবাকই হলো ওরা। বার বার কিশোর বলল, গাড়িটাতে নিশ্চয় কোন সমস্যা আছে। নইলে এত কমে কোনমতেই দিত না।

সন্ধ্যায় ডিনারের পর আমাদের বাড়িতে এল কিশোর আর রবিন, গাড়িটা দেখতে। আমি তখন আমার ঘরে বসে গাড়িটার ছবি আঁকছি। ওটার একটা মডেল বানাব ঠিক করেছি।

'বাজি ধরে বলতে পারি গাড়িটার নকশা আঁকছে সে,' রবিন বলল।

'তাই তো করবে, কাজ একখান পেয়েছে,' হেসে বলল কিশোর। 'ওর মগজ জুড়ে আছে গাড়ি আর গাড়ি। বাতিকটা কতদিন থাকে সেটাই ভাবছি।'

কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটা জ্যাকেট টেনে নিলাম। গাড়ি দেখাতে নিয়ে চললাম ওদের।

কি ভাবে যে ওদের আসার খবর পেয়ে গেছে ফারিহা, সে-ই জানে, যেন গন্ধ পেয়ে ছুটে এল।

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল। জবাবটাও নিজেই দিল, 'নিশ্চয় গাড়ি দেখতে।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। সারাটা দিন স্কুলে যে ভাবে মুখে ফেনা তুলেছে মুসা, না এসে আর থাকতে পারলাম না।'

বাইরে বেরোলাম দল বেঁধে। ঠাণ্ডা, মেঘে ঢাকা রাত। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল। মাটি ভেজা।

ড্রাইভওয়েতে রাখা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। রাস্তা থেকে এসে পড়া আলোয় চমকাচ্ছে নীল শরীরটা, মনে হচ্ছে যেন ঠাণ্ডা নীল আগুন।

'সত্যি সুন্দর,' কিশোর বলল।

হুডে হাত বোলাল রবিন। তারপর নিচু হয়ে হেডলাইটের কভারটা দেখল। 'এত নিচু করে বানানো। একেবারেই রেস কারের মত।'

'আসলেও তাই,' আমি বললাম। 'ভি-এইট ইঞ্জিন। গ্যাস বেশি দিলে গর্জনটা যে করে, শোনার মত।'

দেখেটেখে, খানিকক্ষণ কথা বলে চলে গেল ওরা। ফারিহাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম আমি।

নকশাটা শেষ করতে বসলাম।

রাত প্রায় বারোটা বাজল। আমার ঘুম আসছে না। মা আর বাবা এগারোটাতেই ঘুমাতে চলে গেছে। ফারিহা তো বহু আগেই ঘুম।

সারাটা বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ। আমার জানালার কাঁচে বাড়ি মেরে খটাখট শব্দ

তুলছে ঝোড়ো হাওয়া।

পায়জামা পরলাম। জানালার ধারে গেলাম গাড়িটাকে শেষবারের মত দেখার জন্যে। ড্রাইভওয়েতে বসে আছে যেন গাড়িটা। হঠাৎ করেই আমার কাছে একটা চিতাবাঘের মত লাগল ওটাকে, ওত পেতে আছে যেন হরিণের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে।

পাহাড়ের মাথায় অনেক নিচু দিয়ে উড়ে চলেছে মেঘ। চাঁদ-তারা কোন কিছু চোখে পড়ছে না, সব ঢাকা পড়েছে মেঘে।

জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যাব, হঠাৎ অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল।

এক ধরনের কাঁপা কাঁপা সবুজ আভা ঢেকে ফেলল যেন গাড়িটাকে।

ফ্যাকাশে সবুজ আলোর চক্র গাড়িটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। ঘোরার গতি যত বাড়ছে, তত উজ্জ্বল হচ্ছে আলোটা।

হাঁ হয়ে গেছি। এ কিসের আলো? ভাল করে দেখার জন্যে জানালার কাঁচে কপাল চেপে ধরলাম।

এই প্রথম মনে হলো আমার, গাড়িটাতে ভূতের আসর নেই তো!

ভূতের কথা ভেবে ভয় পেলেও কৌতূহল দমাতে পারলাম না কোনমতেই। যত বড় ভূতই হোক, দেখা আমার চাইই।

এ সবুজ আলোর রহস্য ভেদ করতে না পারলে আমার স্বস্তি নেই।

## এগারো

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি। জুতো জোড়া হাতে। শব্দ শুনে যদি মা কিংবা বাবা দেখতে চলে আসে, ধরা পড়ে যাব। কিছুতেই বোঝাতে পারব না, রাত দুপুরে আমি কোন্ কাজে চলেছি।

হলওয়েতে বসে স্নিকার দুটো পায়ে টেনে দিলাম। ফিতে বাঁধার সময়টুকুও নষ্ট করলাম না। সবুজ আলোটা চলে গেলে আর কোন লাভ হবে না। তার আগেই যাওয়া দরকার।

লিভিং রুমের জানালা দিয়ে শিস কেটে চলে যাচ্ছে বাতাস। জানালাগুলো মেরামত না করা পর্যন্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না। লিভিং রুমে যখন বসি আমরা, বেশি ঠাণ্ডা থাকলে জ্যাকেট-ট্যাকেট কিংবা সোয়েটার পরে থাকি বেশি করে, যাতে শীত কম লাগে।

পুরানো কাঁচের শার্সিতে ঝাপটা দিয়ে খট্‌খট্ আওয়াজ তুলছে বাতাস। মাঝে মাঝে এত জোরাল হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন বাড়িটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

মনে হচ্ছে যেন ভূতের বাড়ি।

ভূতের বাড়ি! ভূতের গাড়ি! দমে গেলাম। বেরোব কি বেরোব না, চিন্তা করতে লাগলাম।

কৌতূহলেরই জয় হলো। জ্যাকেটটা গায়ে দিলাম। সামনের দরজার কাছের ছোট টেবিলটায় রাখা আছে গাড়ির চাবিটা। একবার দ্বিধা করে তুলে নিয়ে পকেটে ভরলাম। তারপর আস্তে করে সামনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস ধাক্কা দিয়ে আবার দরজার ওপর ফেলে দিল আমাকে।

ফরফর করতে লাগল জ্যাকেটের কোনা দুটো। টেনে এনে একসাথে করে জিপারটা তুলে দিলাম কলার পর্যন্ত।

পড়া মাত্র বরফ হয়ে যাচ্ছে রাতের শিশির। সামনের লনে পাতলা তুষারের আস্তর জমে গেছে। পা পিছলে যায়। এর মধ্যে দিয়েই কোনমতে দৌড় দিলাম ড্রাইভওয়ের দিকে।

সবুজ আলোটা নেই আর এখন।

আগের মতই ঘাপটি মেরে বসে আছে যেন গাড়িটা। গায়ের ওপর এসে পড়ছে স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো। দৌড়ে এসে ড্রাইভারের পাশের দরজাটার কাছে দাঁড়ালাম। নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়ার মত।

তুষার কণা লেগে থাকা জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালাম।

অন্ধকার। শূন্য গাড়ি।

ছাতে হাত বোলালাম।

সবুজ আভাটা নেই কেন? অবাক হয়ে ভাবছি। চোখের ভুল ছিল কি আমার? আলোর কারসাজি?

হতাশই লাগছে।

গভীর কোন রহস্য রয়েছে গাড়িটাকে ঘিরে। অথচ ভেদ করতে পারছি না।

রাত দুপুরে, ঝোড়ো আবহাওয়া আর সাংঘাতিক ঠাণ্ডার মধ্যে ড্রাইভওয়েত দাঁড়িয়ে আছি একটা শূন্য গাড়ির দিকে তাকিয়ে।

'কি বোকামি করছ! ভাল চাইলে চলে যাও এখান থেকে!' মনে মনে বকা দিলাম নিজেকে। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে ঘুরে দাঁড়ালাম। পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে।

বড়জোর দুই কি তিন পা এগিয়েছি, কানে এল একটা মোলায়েম কণ্ঠ, 'এসো! উঠে পড়ো গাড়িতে!'

'খাইছে!' নিজের অজান্তেই বিস্মিত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম এত জোরে, আরেকটু হলে পিছলে পড়ে যেতাম তুষারে ঢাকা ড্রাইভওয়েতে।

'জলদি করো! ওঠো! উঠে পড়ো!' আবার ডাকল কণ্ঠটা।

ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্যে সামনের দিকে কুঁজো হয়ে আছি। 'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম। 'কোত্থেকে কথা বলছ?' আমার কথা আমার মুখের ওপরই ছুঁড়ে ফেলল বাতাসের ঝাপটা।

জবাব এল না। শীতের পাতাশূন্য ডালপালার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পায়ের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে বাদামী ঝরা পাতা। যেন আমাকে ঠেকাতে চাইছে। যেতে দিতে চায় না।

দরজার হাতল চেপে ধরে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

ঠাণ্ডা ভয় থরথর করে কাঁপিয়ে দিল আমার সারা শরীর। বুঝতে পারছি কথা যে-ই বলে থাকুক, নির্দেশ মানা উচিত হচ্ছে না আমার। গাড়ির বাইরে থাকলেই ভাল করব।

অকারণে দরজা আটকে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ল আমার। আবার যদি আটকা পড়ি?

পড়লে পড়ব। মনস্থির করে নিলাম। দরজা আটকে যাওয়া, সবুজ আলোর চক্র–এ সব রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। গাড়িতে না ঢুকে সেটা

করতে পারব না।

টান দিয়ে দরজা খুলে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে পড়লাম।

সীট ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে। কাপড় ভেদ করে চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে যেন। নিঃশ্বাস লেগে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে উইন্ডশীল্ড। ঠাণ্ডা, মসৃণ স্টিয়ারিং হুইলে হাত বোলালাম।

'এই, তুমি আছো ওখানে?' গাড়ির ভেতরে চারপাশে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করলাম। 'কেউ কি আছো?'

মেয়েটার গলা শোনার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সাড়া নেই।

ঝোড়ো বাতাসের ভয়ানক ঝাপটা পাতা উড়িয়ে এনে ফেলল জানালার কাঁচে। চমকে গেলাম খড়খড় শব্দে। নিজের অজান্তেই চট করে একটা হাত চলে এল মুখের ওপর, যেন মুখ বাঁচানোর জন্যেই।

'কেউ আছো?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম আবার। 'আমাকে ডেকেছিলে?'

জবাব নেই এবারেও।

গায়ে কাঁটা দিল। পকেটে হাত ঢোকালাম। হাতে লাগল চাবিটা।

বের করে এনে তাকিয়ে রইলাম গোছাটার দিকে। কেন এনেছি? গাড়িটা স্টার্ট দেয়ার একটা অবচেতন ইচ্ছে ছিল কি মনে?

হয়তো ছিল।

রাত দুপুরে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। চোখে ঘুম। মাথাটা কাজ করছে না ঠিকমত। নইলে ইগনিশনে চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিতে যাব কেন?

অল্প একটু মোচড়। তাতে স্টার্ট হয় না ইঞ্জিন। স্টার্ট নেয়াতে হলে সবটা ঘোরাতে হবে।

'কি করছ?' ধমক লাগালাম নিজেকে। 'এ সময় গাড়ি নিয়ে বেরোনোটা হবে পাগলামির সামিল তোমার জন্যে!'

বুঝতে পারছি, আসাটা উচিত হয়নি আমার। ঘরে থাকলেই ভাল করতাম। নিরাপদ। কম্বলের নিচে আরামের ঘুম।

কোনটা করলে ভাল হবে, বুঝতে পারছি। কিন্তু করছি না। যেন অদৃশ্য কোন শক্তি সওয়ার হয়েছে আমার ঘাড়ে। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে এখানে। গাড়িতে উঠতে, ইগনিশনে চাবি ঢোকাতে, মোচড় দিতে বাধ্য করছে।

ঠাণ্ডা একটা ঝাপটা এসে লাগল হাতে। হাতটাকে টেনে নিয়ে গেল কে যেন, রেডিওর সুইচের কাছে। টিপে দিলাম সুইচটা।

অকস্মাৎ বাজনা বেজে উঠবে আশা করেছিলাম। বাজল না। খড়খড় করে উঠল স্পীকার। সেই সাথে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত শব্দ।

একটা বোতাম টিপলাম। তারপর আরেকটা।

না। কোথাও বাজনা নেই।

ভলিয়ুমের নব ধরে পুরোটা ঘুরিয়ে দিলাম। শোনা গেল একটা মেয়ের মোলায়েম কণ্ঠস্বর। 'আমি খারাপ···আমি এত খারাপ···'

'কে কথা বলে!' বলতে গেলাম। বেরিয়ে এল ঘড়ঘড় শব্দ। যেন গলা টিপে ধরা হয়েছে আমার।

'আমি খারাপ···'

হঠাৎ স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। জ্বলে উঠল হেডলাইট। পিছিয়ে যেতে শুরু করল গাড়ি।

চিৎকার করে উঠলাম।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি। ঝটকা দিয়ে সামনে ছুটে গেল আমার মাথা। অল্পের জন্যে স্টিয়ারিঙে বাড়ি খেল না। পিছাতে শুরু করেছে গাড়ি। দেখতে দেখতে ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

## বারো

যেন অদৃশ্য কোন চালক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটাকে। গীয়ার বদলাচ্ছে।

'থামো! কি হচ্ছে?' চিৎকার করে উঠলাম সেই চালকের উদ্দেশে। 'আহ্, থামো না!'

দরজার হাতল চেপে ধরলাম। টান দিয়ে ধরে রেখে গায়ের জোরে ঠেলা দিতে লাগলাম দরজার গায়ে।

খুলল না। তালা আটকে গেছে।

চাকা পিছলে যাচ্ছে তুষারে ঢাকা রাস্তায়। সামনের দিকে ছুটছে এখন। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে।

'কি পাগলামি করছ? কে তুমি? এমন করছ কেন?'

মরিয়া হয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছি। খুলছে না।

গতি বাড়ছে গাড়ির। ছুটে যাচ্ছে বাঁকের দিকে।

স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে গাড়িটাকে রাস্তায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

পা দিয়ে বার বার চাপ দিচ্ছি ব্রেক পেডালে।

কিন্তু থামার বদলে গতি আরও বাড়ছে গাড়িটার।

রেডিওর স্পীকার থেকে অনবরত শোনা যেতে লাগল শীতল খিলখিল হাসি।

'কে তুমি? দেখা যাচ্ছে না কেন তোমাকে?' চিৎকার করে উঠলাম আবার। সেই সঙ্গে ঘ্যাচ করে পায়ের চাপ বসালাম ব্রেক পেডালে। কিন্তু গতি কমল না।

চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরলাম। তাতেও কোন লাভ হলো না।

রাস্তার বাইরে সরে যেতে শুরু করল গাড়ি। চিৎকার করে উঠলাম তীব্র আতঙ্কে। চাকা ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ হচ্ছে। শক্ত মাটিতে লাফিয়ে পড়ে এত জোরে ঝাঁকি খেল গাড়ি, লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল আমার দেহটা। মাথা বাড়ি খেল ছাতে।

দুই হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে, ওটার ওপর ঝুঁকে থেকে ঘোরানোর চেষ্টা করলাম।

রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে পারলাম অবশেষে গাড়িটা।

প্রায় খাড়া নেমে গেছে এখান থেকে রাস্তা। শহরের বাড়িঘর চোখে পড়ছে। অনেক নিচে।

ব্রেকে চাপ দিয়ে চলেছি ক্রমাগত।

ইমার্জেন্সি ব্রেক ধরে টান দিলাম।

ইঞ্জিনের গতি বেড়েই চলেছে। নেমেই চলেছে গাড়ি। দ্রুত। আরও দ্রুত।

'কেমন লাগছে? দারুণ না?'

স্পীকার থেকে ভেসে এল মেয়েটার কণ্ঠ।

'কি হলো? ভাল লাগছে?' জিজ্ঞেস করল আবার।

'থামো! গাড়িটা থামাও, প্লীজ!' গলা দিয়ে স্বর বের করতে পারছি না। স্টিয়ারিংটা লাফাচ্ছে আমার হাতের মধ্যে। ঘুরে যাওয়া রাস্তা ধরে নিচে নামছে গাড়ি। সামলে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।

দূর থেকে ভেসে এল হুইসেলের শব্দ।

ট্রেনের বাঁশি।

মেয়েটার খিলখিল হাসি বাড়ছেই।

'কে তুমি? কোথায় আছো?' রাগ লাগছে এখন আমার।

এত ঠাণ্ডার মাঝেও কপালে ঘাম জমছে। হাতের তালুতে ঘাম। স্টিয়ারিং পিছলে যায়।

'আমার সঙ্গে থেকে চালাতে তো দেখছি ভালই লাগছে তোমার!' খোঁচা দিয়ে বলল কণ্ঠটা। খিলখিল করে হাসল।

'না, মোটেও ভাল লাগছে না আমার!' চিৎকার করে উঠলাম। 'থামো বলছি! গাড়িটা থামাও! অ্যাক্সিডেন্ট করবে তো!'

'থামাব? বেশ,' বিড়ালের মত আয়েশে গর্‌গর্‌ করে উঠল কণ্ঠটা।

ঘ্যাঁচ করে পা'টা নামিয়ে আনলাম আবার ব্রেক পেডালের ওপর। চেপে ধরলাম একেবারে মেঝে পর্যন্ত।

আর্তনাদ করে উঠল টায়ার।

পিছলে গেল গাড়িটা। নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইছে না।

স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করলাম। লাভ হলো না তাতে।

লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল গাড়ি। আমার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

কর্কশ শব্দে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে রাস্তা থেকে পিছলে চলে যাচ্ছে চাকাগুলো।

ঘাস আর ঝোপঝাড়ের ওপর নেমে এসে ঝাঁকি খেতে শুরু করল। পিছলানো বন্ধ হচ্ছে না।

সরে যাচ্ছে লম্বা, কালো গাছপালাগুলোর দিকে।

স্পীকার থেকে বেরিয়ে আসছে এখনও উচ্চকিত হাসির শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে গাছপালাগুলো।

ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে ওগুলোর সঙ্গে। মাত্র আর কয়েক সেকেন্ড।

কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে আমার মগজে প্রতিধ্বনি তুলছে যেন হাসিটা।

ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে।

মরতে চলেছি আমি।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে হুইলটাকে ঘোরানোর চেষ্টা করলাম। গাছগুলোর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাইলাম গাড়িটাকে।

সাংঘাতিক ঝাঁকি লাগছে।

লাফ দিয়ে শরীরটা শূন্যে উঠে মাথাটা আবার ছাতে ঝাঁকি লাগল। 'আঁউক'

করে উঠলাম।

কালো গাছগুলো এখন একেবারে জানালার কাঁচের কাছে দেখা যাচ্ছে। লম্বা ঘাস আর আগাছা থেঁতলাচ্ছে চাকাগুলো।

আবার হুইল ঘোরালাম। গাছগুলো সরে গেল। ঘুরে যাচ্ছে গাড়িটা। উত্তাল ঢেউয়ে পড়া নৌকার মত দোল খেল কয়েকবার। নাক ঘুরে গেল আবার রাস্তার দিকে।

আবার প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি। রাস্তায় উঠে এল গাড়ি।

বাঁক নেয়া রাস্তা ধরে আবার ছুটে চলল। গতি বাড়ছে।

'থামাও গাড়িটা! থামাও!' চিৎকার করে উঠলাম। হুইলটা একটা জীবন্ত প্রাণীর মত ঝাঁকি খাচ্ছে, মোচড় দিচ্ছে আমার দুই হাতের মধ্যে।

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে ভেসে এল মেয়েটার হাসি।

দূরে আবার শোনা গেল ট্রেনের বাঁশি।

'কে তুমি? কেন করছ এ সব?' রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আবার। আমার কথাগুলোও যেন ঝাঁকি খেতে লাগল গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

আবার শীতল হাসি। তারপর গোঙানি মেশানো কথা, 'আমি খারাপ···খুব খারাপ!'

হেডলাইটের আলোয় রেল ক্রসিংটা নজরে এল।

রাস্তার যানবাহন আটকানোর গার্ডরেইল নেমে আসছে। লাল আলো জ্বলছে-নিভছে।

বাঁ দিকে ট্রেনের অবয়বটা দেখতে পাচ্ছি। রাতের বেগুনি আকাশের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে। ভারী গুমগুম আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে ক্রসিঙের দিকে।

আবার বাঁশি বাজাল ট্রেন। ক্রসিঙের দিকে এগোচ্ছে বলে সাবধান করার জন্যে দীর্ঘক্ষণ বোতাম চেপে ধরে রাখল ড্রাইভার।

ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক পেডালে পা মারছি।

কোনই লাভ হচ্ছে না তাতে। একই গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি।

হেডলাইটের আলোয় চকচক করছে গার্ডরেইলের রঙ। তীব্র গতিতে লাইনের দিকে ধেয়ে চলেছে গাড়িটা।

'গুড-বাই, মুসা!' স্পীকার থেকে ভেসে এল মেয়েটার খুশি খুশি কণ্ঠ। 'আশা করি গাড়ি চড়াটা সুখেরই হয়েছে তোমার। জীবনের শেষ গাড়ি চড়া।'

# তেরো

ট্রেনের দুটো হেডলাইটের আলো পড়েছে লাইনের ওপর। এত তীব্র, আলোগুলোর দিকে সরাসরি তাকানো যায় না। চোখের পাতা আধবোজা হয়ে যায় আপনাআপনি।

একনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছি। গলা ফাটানো চিৎকার।

ট্রেনের ইঞ্জিনের বিকট শব্দেও ঢাকা পড়ল না সে-শব্দ।

আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। মাঝপথে কেটে গেল আমার

চিৎকার।

পরক্ষণে আবার একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে, প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা যখন সামনে ছুটে গেল, ঠুকে গেল স্টিয়ারিঙে।

ঝাঁকি দিয়ে আবার ফিরে এল মাথাটা। আছড়ে পড়ল সীটের ওপর।

এমন ভাবে শব্দ করছে চাকাগুলো, যেন চিৎকার করে কাঁদছে।

সামনের বাম্পারটা গুঁতো মারল কাঠের গার্ডরেইলে। থেমে গেল গাড়িটা।

গর্জন করতে করতে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা।

তাকিয়ে আছি বগিগুলোর দিকে। সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে একটার পর একটা। মাথা ঘুরছে আমার। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁপাচ্ছি। হাঁ করে বাতাস টানছি। চিৎকার করতে করতে গলার ভিতরটা চিরে গেছে। জ্বরের রোগীর মত থরথর করে কাঁপছে গা।

ঘটারং-ঘট ঘটারং-ঘট করে পার হয়ে গেল ট্রেন। আবার বেজে উঠল টানা, দীর্ঘ বাঁশি। কমতে কমতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা।

এরপর নীরবতা। কানে আসছে শুধু আমার ভারী নিঃশ্বাস আর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির শব্দ।

ধীরে ধীরে পিছানো শুরু করল গাড়িটা। গার্ডরেইল থেকে সরে যাচ্ছে।

'দারুণ মজা, তাই না?' রেডিওর স্পীকারে ফিসফিস করে উঠল মেয়েটার কণ্ঠ। 'রোম খাড়া করে দিয়েছে না?'

'না!' রাগে চিৎকার করে উঠলাম। 'তোমার পাগলামি সহ্য করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

এক মোচড়ে অফ করে দিলাম রেডিওর নব।

কিন্তু তাতে স্পীকারের হাসি কমল না।

আবার ঘরবাড়ি, গাছপালার পাশ কাটিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে গাড়ি। ফিরে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে পাক খেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তাটা ধরে। দেখতে পাচ্ছি সবই, কিন্তু দেখার মত অবস্থা নেই আমার। কাঁপছি। কানে বাজছে এখনও ট্রেনের বাঁশি। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি বিকট শব্দ করতে করতে চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাওয়া বগিগুলো।

'কে তুমি?' আবার জিজ্ঞেস করলাম। দম আটকানো শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে। 'তুমি কি ভূত? এই গাড়িটাকে আসর করে রেখেছ?'

জবাব নেই।

'কিছু তো বুঝতে পারছি না আমি!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'জলদি বলো না, কে তুমি? আমাকে খুন করতে চাইছ কেন?'

নীরবতা।

তারপর শোনা গেল চাপা গোঙানি। 'আমি খারাপ···আমি এত খারাপ!'

গতি ধীর হতে হতে থেমে গেল গাড়িটা।

জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। অবাক হয়ে গেলাম বাবা আর মা'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। গায়ের ঢোলা পোশাকগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে। ড্রাইভওয়েতে ছুটে আসছে ওরা। খালি পায়ে।

বাড়ি ফিরেছি! বাড়ি! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

টান দিয়ে ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুলে ফেলল বাবা। 'মুসা!' রাগে চিৎকার করে উঠল বাবা। 'কি করলি এটা!'

হাত চেপে ধরে টান দিয়ে গাড়ি থেকে বের করে নিল আমাকে। রাগে চোখ জ্বলছে। বাবাকে এত রেগে যেতে আর দেখিনি।

পেছনে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে মা। চোখে পানি দেখতে পেলাম।

'এমন একটা কাজ করতে পারবি তুই, কল্পনাই করিনি,' মা'র গলা ধরে আসছে।

'আমিও ভাবতে পারিনি,' দাঁতে দাঁত চেপে বাবা বলল। আমার হাতে চেপে বসেছে তার আঙুলগুলো।

'আমি···আমি তো নিয়ে যাইনি!' বলতে গেলাম।

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে গাড়ির ভেতরে তাকাল বাবা। 'আবার মিছে কথা! খবরদার, বানিয়ে কথা বলবি না! গাড়িতে কেউ নেই। কে তোকে নিয়ে গেল তাহলে? ড্রাইভিং সীটে তো বসেছিলি তুইই।'

'কিন্তু···আমাকে বলতে দেবে তো!'

বড় করে দম নিলাম। কোন্‌খান থেকে শুরু করব? কি করে বোঝাব ওদের, গাড়িটা আমি চালাইনি?

'মুসা, কি হয়েছে?' আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠল একটা মেয়েকণ্ঠ।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ড্রাইভওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসছে টিনা।

'কিছু হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে। দৌড়ানোর কারণে কাঁধের ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে লম্বা চুলগুলো। 'এত রাতে কি করছো তোমরা এখানে?'

'তুমি কে?' অবাক হলো মা। গালের পানি মুছল। 'মুসার বন্ধু?'

'এ পাড়ায় নতুন এসেছে ওরা,' মাকে বললাম।

'আমি টিনা কুপার,' কাছে এসে বলল সে। 'ঘুম আসছিল না। জেগে ছিলাম। কথা শুনে জানালার কাছে এসে দেখি মুসা বাইরে···' বাক্যটা শেষ না করেই থেমে গেল সে।

'ভীষণ অন্যায় করেছে ও,' কোনমতেই বাবার রাগ যাচ্ছে না। আমার কব্জিতে শক্ত হয়ে আছে তার হাতের আঙুলগুলো। 'ভয়ানক কাজ!'

আমার ওপর স্থির হলো টিনার দৃষ্টি।

'মোটেও ঠিক না এটা!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'বাবা···মা···বিশ্বাস করো! ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটাতে চড়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমি চালিয়ে নিয়ে যাইনি।'

'আবার মিছে কথা!' মা-ও রেগে গেল এবার।

'শেষবারের মত সাবধান করছি, একটা মিথ্যে বলবি না আর!' ধমক দিয়ে বলল বাবা।

আর না বলে পারলাম না। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বিশ্বাস করো আর না-ই করো, গাড়িটাতে ভূত আছে!'

ভুরু কুঁচকে গেল বাবার। মা'র চোখ বড় বড়। টিনা হাঁ।

'আমি জানতাম, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যা বলছি সত্যি বলছি! একটা মেয়ের গলা শুনেছি গাড়ির ভেতর। শীতল হাসি হাসছিল সে। বার বার একই কথা বলছিল—আমি খারাপ, খুব খারাপ। গাড়িটা সে-ই চালাচ্ছিল। আমি চালাইনি। আমি ওটাকে কন্ট্রোলই করতে পারিনি। ভূত আছে গাড়িতে। কসম খোদার! ভূতটা···'

'থাম্! অনেক হয়েছে!' গর্জে উঠল বাবা। 'ভূত দেখার ব্যারাম কি আর নতুন

নাকি তোর! তুই কি ভাবিস তোর এই আষাঢ়ে গল্প আমি বিশ্বাস করব?'

'শয়তানি তো করেছিস করেছিস, আবার মিছে কথা!' মা-ও রেগে যাচ্ছে বাবার মত।

'ভূতটা আমাকে খুনই করে ফেলেছিল আরেকটু হলে!' বোঝাতে না পেরে আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছে।

চোখের পাতা সরু করে তাকাল টিনা। বদলে যাচ্ছে ওর মুখের ভঙ্গি। চোয়াল কাঁপতে শুরু করেছে। ভয় পেতে আরম্ভ করেছে যেন সে। মৃদু স্বরে বলল, 'মুসা বোধহয় ঠিকই বলছে।'

'আরে নাহ্, ওকে তুমি চেনো না!' মা বলল। 'ওর কাজই হলো ভূত আবিষ্কার করা।' আমার দিকে তাকাল, 'আমাদের কি ভাবিস তুই? কি বলতে চাস, গাড়িটাকে ড্রাইভওয়ে থেকে নিসনি?'

'ওকে কি জিজ্ঞেস করছ!' ধমকের সুরে বলল বাবা। 'গাড়ি নিয়ে পাগল হয়ে আছে ও। দিনে সাহস পায়নি, তাই রাত দুপুরে চাবি চুরি করে চালাতে নিয়ে গিয়েছিল। এ তো সোজা কথা।'

'আমি চালাইনি!' মরিয়া হয়ে বললাম। 'গাড়িটাতে ভূত আছে! প্রমাণ করে দিতে পারব আমি! এক বিন্দুও মিথ্যে বলছি না!'

বাবার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়লাম গাড়ির ভেতরে। 'এসো, শুনে যাও! ভূতটা কথা বলে। স্পীকারের ভেতর থেকে বেরোয় তার কথা। ও আছে কিনা নিজেই বলবে তোমাদের।'

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সবাই।

রেডিওর সুইচ অন করে দিলাম।

'বলো,' কণ্ঠটাকে ডাক দিলাম, 'কথা বলো। কি কাণ্ডটা করেছ তুমি, শোনাও সবাইকে। বলো। চুপ করে আছো কেন!'

## চোদ্দ

পরদিন রাতে। ডিনারের পর নিজের ঘরে বসে ফোনে কিশোরের সঙ্গে কথা বলছি।

'মাত্র তিরিশ সেকেন্ড কথা বলতে পারব। কারও সঙ্গে দেখা করতে পারব না। কেউ বাড়িতে এলেও না,' ওকে জানালাম। 'নতুন আইন। নিজের ঘরে বন্দি থাকার হুকুম দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'তারমানে শাস্তি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু কেন?'

'বলতে অনেক সময় লাগবে।'

'ভাল বিপদেই পড়েছ!'

'তা পড়েছি। বাবার রাগ না পড়লে আর...'

'কিন্তু কারণটা কি? কি করেছ তুমি?'

'ওদের ধারণা, গাড়িটা আমি চুরি করে চালিয়েছি। তারপর মিথ্যে কথা বলেছি।'

'সত্যি বলেছ? গাড়িটা সত্যি চালিয়েছিলে?'

'আসল কথাটা না জানলে সে-রকমই ভাববে সবাই।'

ঘড়ির টাইমার বেজে উঠল। 'আমার সময় শেষ।' বলে লাইন কেটে দিলাম।

তিরিশ সেকেন্ডে ক'টা কথা বলা যায়? টাইমারটা আছড়ে ফেললাম টেবিলের ওপর। মা দিয়েছে, কতক্ষণ ফোন করলাম, হিসেব রাখার জন্যে।

অন্যায় করা হচ্ছে আমার ওপর। ভীষণ অন্যায়। অথচ আমি কোন অপরাধ করিনি।

গাড়িটা যে ভুতুড়ে, কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয়। কাউকে বোঝাতে পারছি না।

ঘর থেকে বেরিয়ে হল ধরে ছুটলাম। ফারিহার ঘরের দিকে। দেখি, ওকে বোঝানো যায় কিনা। হয়তো সাহায্য পাব ওর কাছ থেকে।

একা একাই হাসতে শুনলাম ওকে। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি কম্পিউটারের কীবোর্ডের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। মনিটরের দিকে চোখ। গেম খেলছে।

বেশ কঠিন খেলা। তবে মজার।

আমার সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। 'কি? খেলবে?'

'না,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। 'আমার জন্যে সব রকম বিনোদন নিষিদ্ধ, ভুলে গেছ?'

ঠোঁট লম্বা করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ! খালা-খালুকে এত রেগে যেতে দেখিনি আমি আর।'

ওর বিছানার কিনারে বসে পড়লাম। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করেছ? গাড়ির মধ্যে ভূত আছে, এ কথা?'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল ফারিহা। 'না। তবে রহস্যময় একটা কিছু যে ঘটছে গাড়িটাকে ঘিরে, সেটা আন্দাজ করতে পারছি।'

'পারছ!' ভুরু কুঁচকে ফেললাম।

মাথা ঝাঁকাল ফারিহা।

লাফ দিয়ে উঠে এসে ওর কাঁধ চেপে ধরলাম। 'কি পারছ? জলদি বলো! জলদি!'

# পনেরো

'ওই নতুন মেয়েটা,' ফারিহা বলল। 'টিনা কুপার।'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ও-ই তো ভূত!'

'ভূত কিনা জানি না, তবে মেয়েটা রহস্যময়,' জবাব দিল ফারিহা। বিছানার অন্য প্রান্তে গিয়ে বসে পড়ে দুই হাত রাখল কোলের ওপর। 'ভেবে দেখো, গাড়িটা যেদিন এল, ঠিক সেই দিনই সে-ও এসে হাজির। তারপর দরজাটা যখন খুলতে পারছিলে না তুমি, সে এসে খুলে দিল। কাল রাতেও একেবারে সময়মত হাজির হয়ে গেল। এত রাতে। কি জবাব এগুলোর?'

মাথা চুলকালাম। 'একটাই জবাব। সে ভূত।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল ফারিহা, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। টিনা ভূতটুত নয়, ও সাধারণ মানুষ, আমাদের মতই। গাড়িটাতেও বাস করে না সে।

আশেপাশের কোনও একটা বাড়িতে থাকে।'

আশেপাশের বাড়ি! তাই তো! বলে উঠলাম, 'এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, কোন্ বাড়িতে থাকে!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দৌড়ে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকলাম। ছোঁ দিয়ে তুলে নিলাম কর্ডলেস টেলিফোনটা। ফিরে এলাম ফারিহার ঘরে।

দ্রুত কয়েকটা বোতাম টিপলাম। 'হ্যালো? ইনফরমেশন? আমি কুপারদের বাড়িতে ফোন করতে চাই।' ঠিকানাটা দিয়ে বললাম, 'এই পাড়ায় নতুন এসেছে।'

আমার দিকে তাকিয়ে আছে ফারিহা।

অপারেটরকে সময় দিলাম, নম্বরটা খুঁজে বের করার জন্যে।

'সরি,' জানাল অবশেষে অপারেটর। 'ওই এলাকার রেজিস্টারে কুপার বলে কেউ নেই।'

যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিলাম।

ফিরলাম ফারিহার দিকে।

সব শুনে ফারিহা বলল, 'মনে হয় টেলিফোনের কানেকশন দেয়া হয়নি এখনও কুপারদেরকে।'

ফারিহার হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে বিছানা থেকে নামিয়ে নিলাম ওকে। 'চলো। যাই।'

'কোথায়?' হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। 'কোথায় যাব?'

'টিনাদের বাড়িতে। তোমার কাছে প্রমাণ করে দেব, ও ভূত।'

'কিন্তু···তোমার যে শাস্তি চলছে!' ফারিহা বলল।

'দুত্তোর, শাস্তির নিকুচি করি!' খেপে উঠলাম। 'শোনো, মা-বাবা দু'জনেই এখন বেসমেন্টে। বাবাকে কাজে সাহায্য করছে মা। আগামী কয়েক ঘণ্টায় অন্তত বেরোবে না। ততক্ষণে কাজ সেরে চলে আসতে পারব আমরা।'

পা টিপে টিপে নিচতলায় নেমে এলাম দু'জনে। দুটো টর্চ আর জ্যাকেট নিলাম। মাটির নিচের ঘর থেকে ভেসে আসছে মা-বাবার কথার শব্দ। তর্ক করছে কিছু নিয়ে। বাবার এ সব মিস্ত্রীগিরি মা'র পছন্দ না। বলে, যার কাজ তাকে দিয়ে দাও। ঝামেলা শেষ। কিন্তু বাবা করবেই। ঝগড়াটা সে-জন্যেই বাধে।

করুকগে ঝগড়া। যত বেশি করবে আজ, ততই ভাল আমাদের জন্যে। সময় পাব।

নিঃশব্দে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম দু'জনে। ঠাণ্ডা, মেঘে ঢাকা রাত। আকাশে চাঁদ-তারা কোন কিছুই নেই।

প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়িটার পাশ কাটালাম আমরা। ড্রাইভওয়েটা শূন্য, নির্জন, অন্ধকার। সবুজ আভা জ্বলছে না এখন গাড়িটাকে ঘিরে। সামনের সীটে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে না কোন ভূত।

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম দু'জনে। কাছেই, মরা পাতার কার্পেটের ওপর হুটোপুটি করছে কিসে যেন। কাঠবিড়ালিই হবে।

'কোন্ বাড়িটায় উঠেছে ওরা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

পরের ব্লকটা দেখালাম। 'ফ্র্যাঙ্কলিনদের বাড়িটায়। চেনো না? ওই যে পুরানো, ইঁট বেরোনো বাড়িটা। সামনে বিরাট বারান্দা।'

রাস্তার বাতির আলো এখানে এসে পড়ছে না। আমাদের আগে আগে নেচে নেচে চলেছে টর্চের আলো। গতরাতে যেমন ঝোড়ো হাওয়া ছিল, আজ তার

উল্টো। একেবারে নিথর একটা রাত। এক বিন্দু বাতাস নেই। গাছের পাতাও কাঁপছে না। কিছুই নড়ছে না।

ব্লকের দ্বিতীয় বাড়িটাই ফ্র্যাঙ্কলিন হাউস। কোণের কাছে এসে দেখতে পেলাম একটা আলোও জ্বলছে না বাড়িটাতে। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি নেই।

'মনে হচ্ছে শুয়ে পড়েছে সবাই,' বিড়বিড় করে বলল ফারিহা। 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি!'

সামনের আঙিনায় বিছিয়ে থাকা শুকনো পাতায় মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলছে আমাদের জুতো। টর্চের আলো মাটির দিকে করে রেখে বারান্দার দিকে এগোলাম আমরা।

বারান্দার দরজাটা খোলা। কব্জা থেকে ঝুলছে। ভেতরের খবরের কাগজের গাদা দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকেও। অনেকগুলো সোডার ক্যান গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

'দেখলে?' ফিসফিস করে বললাম। 'এখানে কেউ থাকে না। এর মানেটা কি বুঝতে পারছ? পোড়ো বাড়ি। আর পোড়ো বাড়িতে যে ভূত থাকে এটা তো সবারই জানা।'

বাড়িতে জীবন্ত কেউ নেই, এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সামনের জানালার কাছে চলে এলাম। জানালার চৌকাঠ ধরে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দেহটাকে উঁচু করলাম।

লিভিং রুমটা অন্ধকার। নীরব।

ধুলো জমে থাকা জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো ফেললাম ভেতরে।

আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। একটা রঙের বালতি উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা আরও এক গাদা খবরের কাগজ।

'কি দেখা যাচ্ছে?' ফারিহা জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না,' জানালাম।

সরে এসে ঘুরে চলে এলাম বাড়িটার পাশে। পাশের জানালা দিয়ে আলো ফেললাম। এটা বেডরুম। খালি। আসবাব নেই। জীবনের কোন চিহ্নই নেই।

আলো নামিয়ে ফারিহার দিকে ঘুরলাম। 'এখানেও কেউ নেই। আর কোন সন্দেহ আছে তোমার?'

'কিন্তু আরও ঘর তো রয়েছে। দেখা হয়নি।'

'দেখলেও লাভ নেই। কোনটাতেই কিছু পাব না। অন্তত জ্যান্ত মানুষ বাসের চিহ্ন।'

'টিনা তোমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে,' জবাব দিল ফারিহা।

'তা কেন দেবে?'

'সেটাই তো রহস্য। কারণ নিশ্চয় আছে। আমি এখনও বলছি, সব কিছুর মূলে ওই গাড়ি। যত রহস্য ওটাকে ঘিরেই।'

তাকিয়ে রইলাম ফারিহার দিকে।

ওর কথা ঠিক হলে, সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে গাড়ি রহস্যের সমাধান হলেই। কি করে সমাধান করব? ভূতের কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। রবিন না। কিশোর না। ওদেরকে দিয়ে কোন সাহায্য হবে না। এই যে এখন যেমন হলো না ফারিহাকে দিয়ে। যা করার আমাকে একাই করতে হবে।

কিন্তু কি করব?

বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেল চকিতে।

# ষোলো

বিশ্বাস না করলেও কিশোরকে সব বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু পরদিন স্কুলে এল না সে। শরীর খারাপ করেছে তার। রবিন এল। তাকে সব খুলে বললাম। গাড়িতে করে রাত দুপুরে আমার চলে যাওয়ার ব্যাখ্যাটা দিল সে এ ভাবে–গাড়ি নিয়ে অতিরিক্ত উত্তেজনায় আমার মগজের মধ্যে গড়বড় হয়ে গিয়েছিল। চাবিটা যেহেতু নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতে প্রমাণ হচ্ছে অবচেতন ভাবে আমিই স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছি খানিকক্ষণ। চোখে হয়তো ঘুম ছিল। আধো ঘুমের মধ্যে গাড়িও চালিয়েছি, দুঃস্বপ্নও দেখেছি।

কি ব্যাখ্যা!

রাগে এ ব্যাপারে আর আলোচনা করাই বন্ধ করে দিলাম ওর সঙ্গে। যে বুদ্ধিটা করেছি গত রাতে, সেটাই করে দেখতে হবে।

একটা আর্ট প্রোজেক্টে ওকে সাহায্য করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। স্কুল থেকে যখন বেরোলাম, সূর্য অস্ত গেছে। পাতাশূন্য গাছগুলোর মাথায় উঠেছে ফ্যাকাশে রঙের আধখানা চাঁদ।

শাস্তি হিসেবে মা বলে দিয়েছে, স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে হবে, অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। কিন্তু নিষেধ মানলাম না। অকারণে আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কোন অপরাধই আমি করিনি। রহস্যটার সমাধান করে আমি নির্দোষ, এটা প্রমাণ করে দিয়ে ছাড়ব।

রাতে বুদ্ধি করেছি, মিস্টার মেলভিলের সঙ্গে দেখা করব। একমাত্র ওই লোকই এখন আমাকে সাহায্য করতে পারে।

বাসে করে রওনা হলাম। কল্পনায় দেখতে পেলাম তার বাজপাখির মত বাঁকা নাক, ছোট ছোট নীল চোখ–বরফের মত শীতল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছি। বাইরে ধূসর সন্ধ্যা। সড়াৎ সড়াৎ করে পার হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, বাড়িঘর। ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছি। ঘেমে যাওয়া হাত মুছলাম জিনসের উরুতে।

স্টপেজে নেমে হেঁটে মিস্টার মেলভিলের বাড়ির সামনের বারান্দার কাছে যখন এসে দাঁড়ালাম, হাঁটু কাঁপছে আমার। গলা শুকিয়ে কাঠ। কেন কে জানে, লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছি এখন আমি। কিন্তু উপায় নেই। কথা তার সঙ্গে বলতেই হবে।

বাড়ির ভেতর থেকে টেলিভিশনের আওয়াজ আসছে।

বেল বাজালাম। ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার পাল্লা ফাঁক হলো। উঁকি দিল মিস্টার মেলভিল। মাথা কাত করে সন্দিহান ভঙ্গিতে তাকাল আমার দিকে।

সেই আগের দিনের মতই পোশাক পরা। ফ্লানেলের শার্ট। সুতীর ওভারঅল। চিরুনী না দেয়া চুল এলোমেলো হয়ে মুখের ওপর এসে পড়েছে।

'আ-আমাকে চিনতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

খুদে খুদে বাজপাখির চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

জবাব দিল না।

আবার বললাম, 'আমার বাবা গত সপ্তাহে আপনার কাছ থেকে একটা গাড়ি কিনেছিল। মনে পড়ে? মিস্টার রাফাত আমানের কথা?'

মাথা ঝাঁকাল সে। দরজাটা আরও কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল। 'তা তোমার জন্যে কি করতে পারি, ইয়াং ম্যান?'

রাস্তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমার মনে হলো বাবাকে খুঁজছে। 'কিসে এলে?'

'বাসে,' জানালাম ওকে। 'কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে, মিস্টার মেলভিল, গাড়িটা সম্পর্কে।'

ঝিক করে উঠল তার চোখ। মুখটা কুঁকড়ে গেল ভ্রূকুটিতে। 'সরি। আমার এখন সময় নেই।' দরজাটা লাগিয়ে দিতে শুরু করল সে।

'বেশিক্ষণ লাগবে না,' তাড়াতাড়ি বললাম। 'কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আমি ভাবছি···'

'সরি,' আবার একই কথা বলল সে। হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'গাড়িটা নিয়ে কথা বলার সময় সত্যিই নেই এখন আমার।'

'প্লীজ। একটা সেকেন্ডের জন্যে ঘরে আসি? আমি···'

'না, আসার দরকার নেই। যাও এখন,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে জবাব দিল মিস্টার মেলভিল। আরও কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, ফোন বেজে উঠল এ সময়।

আমাকে 'গুড-বাই' বলে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ফোন ধরার জন্যে।

'ওর সমস্যাটা কি?' বিড়বিড় করে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

গাড়ির কথা জিজ্ঞেস করব শুনে অমন বদলে গেল কেন?

সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম ঘরের ভেতরে।

ম্যান্টলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

ফ্রেমে বাঁধানো অনেক বড় একটা ছবি। একটা মেয়ের।

ছবির দুই পাশে দুটো মোমবাতি জ্বালানো।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে আমার।

টিনার ছবি।

ছবির দু'পাশে এ ভাবে মোম জ্বেলে রাখার মানে হলো, মেয়েটা মৃত।

## সতেরো

বাড়িতে ঢুকেই আগে ফারিহার সঙ্গে দেখা করলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'ঠিকই বলেছি আমি! তোমরা বিশ্বাস করো আর না করো!'

আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ফারিহা, 'তার মানে?'

'টিনা আসলেই ভূত। সে মারা গেছে। মিস্টার মেলভিলের বাড়িতে তার ছবি দেখে এলাম। ছবির দুই পাশে মোমবাতি জ্বালানো।'

'সত্যি!' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল ফারিহা, 'কি করবে তাহলে এখন?'

'মা-বাবাকে বলতেই হবে,' আমি বললাম। 'টিনার ব্যাপারে সাবধান করে দিতে হবে। ওই গাড়িতে চড়াটা এখন ভয়ানক বিপজ্জনক। মিস্টার মেলভিল একটা চালাকি করেছে আমাদের সঙ্গে। ভূতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গাড়িটা গছিয়ে দিয়েছে আমাদের। নইলে এত কমে এত দামী গাড়ি কেউ দেয়! এখুনি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। ফেরত নিতে না চাইলে পুলিশের ভয় দেখাতে হবে। মোট কথা, গাড়িটা বিদেয় করতে হবে আমাদের বাড়ি থেকে।'

*

'গাড়িটা ভুতুড়ে। আমি প্রমাণ করে দিতে পারব,' সেদিন ডিনারে বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘোষণা করলাম। 'সে-রাতের মেয়েটার কথা মনে আছে? রাত দুপুরে এসে যে উদয় হয়েছিল?'

'মুসা, শান্তিতে খেতেও দিবি না নাকি আমাদের?' রেগে উঠল বাবা।

'আজ রাতে তোর পছন্দমত খাবার রান্না করা হয়েছে, খেতে চেয়েছিলি,' মা বলল। 'কাজেই অকারণে ফালতু কথা বলে মজাটা নষ্ট করিসনে।'

'মজা নষ্ট?' চিৎকার করে উঠলাম। ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করছি, আর ওরা বলছে মজা নষ্ট!

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঠেলা লেগে পেছনে উল্টে পড়ে গেল চেয়ারটা।

'মুসা! বোস্!' ধমকে উঠল বাবা।

'গাড়িটা ভুতুড়ে!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। 'ভূত বাস করে ওটাতে। একটা মেয়ে ভূত। ভীষণ পাজি। মিস্টার মেলভিল আমাদের ঠকিয়েছে।'

'ও ঠিকই বলছে, খালু,' মিনমিন করে বলতে গেল ফারিহা। 'গাড়িটাতে···'

'তুই থাম!' ধমক লাগাল মা। 'ওর মত ভূতের রোগে ধরতে আরম্ভ করেছে নাকি তোকেও?'

'রোগ আসলে তোমাদের মগজে! জেদের রোগ! বিশ্বাস করতে না চাওয়ার রোগ!' মাথা ওপরে তুলে মুঠো নাচাতে নাচাতে চিৎকার করতে থাকলাম আমি। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।

'মুসা,' মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারল না মা, 'প্লেটটা নিয়ে যা এখান থেকে! বিদেয় হ! নিজের ঘরে বসে খা-গে!'

'মা, আমার কথা শুনতেই হবে তোমাদের···'

'যা! বেরো!'

'কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি!'

'আর একটা শব্দও নয়। হয় যা, নয়তো সারা জীবনের জন্যে ঘরে আটকে রাখব।'

নরম হলাম না। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম খাবার ঘর থেকে। প্লেটটা না নিয়েই। খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে আমার।

চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ঘুষি মেরে দেয়াল ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমি বুঝতে পারছি, যে কোন মুহূর্তে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবে। মা-বাবা-ফারিহা, এদের যে কেউ মারা পড়তে পারে। সব জানি। সব বুঝতে পারছি। কিন্তু ওদের বাঁচানোর কোন উপায় করতে পারছি না। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল আমার।

ঘরে ঢুকতেই বেজে উঠল আমার ঘরের ফোনটা।

থাবা দিয়ে তুলে নিলাম। 'হালো?'

'মুসা? আমি। আমি টিনা।'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম। 'কে?'

'টিনা। চিনতে পারছ না?'

'টিনা!' বিড়বিড় করলাম।

'মুসা, শোনো, তোমাকে সাবধান করার জন্যে...'

'করা লাগবে না, টিনা। সত্যিটা আমি জানি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল টিনা। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'তুমি জানো?'

'জানি,' জবাব দিলাম। গলা কাঁপছে আমার। 'আমি জানি তুমি কে। জানি তোমার আসল পরিচয়।'

'ও, জানো। তাহলে আর কি বলব। সাবধানে থেকো। রাখি।'

## আঠারো

সাবধানে থেকো! হুমকি দিয়েছে আমাকে ভূতটা। ওর ফিসফিসে শীতল কণ্ঠ মেরুদণ্ডে শিরশিরানি তুলল আমার।

হাত কাঁপছে। লম্বা দম নিয়ে আটকে রাখলাম ফুসফুসের মধ্যে।

শান্ত হও...শান্ত হও...আদেশ দিলাম নিজেকে। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগলাম বুকের ধুকপুকানি বন্ধ হওয়ার জন্যে। মাথাটা ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে। মা-বাবা আর ফারিহাকে বাঁচাতে হলে উপায় একটা বের করতেই হবে এখন আমাকে।

দুই হাত ঠেলে দিলাম জিনসের পকেটে। পায়চারি শুরু করলাম। কি করব এখন? জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। কি করা যায়?

টেবিলের সামনে বসে গাড়ির মডেলের টুকরোগুলো গোছাতে শুরু করলাম। কাজ করলে অস্থির মনটা স্বাভাবিক হতে পারে এই আশায়। তখন বুদ্ধি খুলবে।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না। টুকরোগুলো যে ভাবে ছিল, সে-ভাবেই রইল। চুপ করে তাকিয়ে আছি সেগুলোর দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই ভাবছি।

নিচ থেকে বাবার ডাক কানে আসতে চমকে উঠলাম।

সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলাম। বাবা, মা, ফারিহা সবার গায়ে কোট।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'নরিনাকে দেখতে,' হলের আয়নায় তাকিয়ে স্কার্ফটা ঠিকমত লাগাতে লাগাতে জবাব দিল মা। 'ভুলে গেছিস? পুরো সপ্তা ধরেই অসুস্থ। আজকে দেখতে যাব বলেছিলাম।'

'ও, আমাকেও যেতে হবে?' আলমারি থেকে কোট বের করতে পা বাড়ালাম।

'না না, তোর আর যাওয়া লাগবে না,' মা বলল। 'বরং বাড়িতেই থাক। মাথাটা ঠাণ্ডা কর।'

'তোর কাণ্ড দেখলে মাঝে মাঝে অবাক লাগে আমার, মুসা,' বাবা বলল। 'বুদ্ধিসুদ্ধি তো কোনটাই কম না। সাহসও আছে। তারপরেও এতবড় ধাড়ি ছেলে যে ভূতের ভয়ে কি ভাবে কাবু হয়ে থাকিস!'

হাত নেড়ে থামিয়ে দিলাম বাবাকে। 'থাক থাক, ওসব আর শোনার দরকার নেই আমার। বিশ্বাস করতে চাও না, কোরো না···ঠিক আছে, বাড়িতেই থাকছি আমি। আমাকে নিয়ে আর তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

হল ধরে গটগট করে হেঁটে গিয়ে ল্যাম্পের সুইচটা অন করে দিল বাবা।

'তারটা এখনও থেকে থেকেই চড়চড় করে,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বাবা বলল। 'কোনখানে যে শর্টটা হয়ে আছে, খুঁজেই পেলাম না।'

হলওয়ের টেবিলে গাড়ির চাবিটা পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়ি নিচ্ছ নাকি?'

'কেন?' মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল বাবা।

'বাবা, তোমাদের দোহাই লাগে, ওটাতে করে বেরিও না,' কাতর অনুনয় করলাম। 'আমি সত্যি বলছি···'

'নাহ্, ডাক্তারের কাছে তোকে নেয়াই লাগবে দেখতে পাচ্ছি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল বাবা।

মা বলল, 'মেহরাবকে ফোন করেছিলাম। সে আসছে আমাদের নিয়ে যেতে। আমাদের গাড়িতে করে যাচ্ছি না।'

যাক, আপাতত বাঁচল! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার।

নরিনা ফুফু বাবার দূর সম্পর্কের বোন। মেহরাব তার স্বামী।

'খবরদার,' সাবধান করল মা, 'গাড়িটায় হাত দিবি না আর।'

'মাথা খারাপ! আরও যাই ওটার কাছে। তোমাদেরই উঠতে বারণ করছি···'

'হয়েছে, থাম। আবার শুরু করিসনে,' তাড়াতাড়ি আমার মুখ বন্ধ করে দিল মা।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরোলাম। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি মেহরাব ফুফা না আসা পর্যন্ত অবশেষে এলেন তিনি, সবুজ টরাস গাড়িটাতে চড়ে।

তাঁকে বললাম, 'ফুফুকে আমার সালাম দেবেন। আর বলবেন, তাঁর জন্যে আমি দোয়া করছি।'

মা আর ফারিহা পেছনে উঠে বসল। বাবা উঠল সামনে। ফিরে তাকাল আমার দিকে, 'মুসা, ঝামেলা বাধাসনে কিন্তু।'

'না, বাধাব না। ভেবো না।' বাবাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, 'ঘর থেকেই বেরোব না আমি।'

'আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব,' মা বলল। লাগিয়ে দিল তার পাশের দরজাটা।

পিছিয়ে গেল সবুজ গাড়িটা। গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। নাক ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল শহরের দিকে।

আমাদের গাড়িটার দিকে তাকালাম। দুই ইঞ্চি নেমে রয়েছে ড্রাইভারের পাশের জানালাটা। অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করলাম। মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে মা আর বাবাকে কথা দিয়েছি ওটার কাছে যাব না, ভুলেই গেলাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম ওটার দিকে। মুখ নামিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

'টিনা, আছো নাকি তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব নেই।

রাস্তার আলোয় ভেতরের চকচকে সাদা চামড়া মাখন রঙা আভা ছড়াচ্ছে।

'টিনা? শুনছ?'

জবাব এল না এবারেও।

জোর একটা টান অনুভব করলাম। কেউ যেন অদৃশ্য হাতে ধরে টানছে আমাকে। ওঠাতে চাইছে গাড়ির ভেতর।

'না!' চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি আর উঠছি না ওটাতে!'

সরে যেতে চাইলাম। পালিয়ে যেতে চাইলাম বাড়ির ভেতরে। নিরাপদ আশ্রয়ে।

কিন্তু অদৃশ্য শক্তিটা টেনেই চলল আমাকে।...টানছে!...টানছে!

'না না, ছাড়ো আমাকে!...ছেড়ে দাও!'

টানছে...টানছে...

দরজার হাতলটা চেপে ধরলাম।

খুলতে শুরু করলাম দরজাটা।

## উনিশ

যেয়ো না, মুসা! ঢুকো না! সাবধান করলাম নিজেকে।

এ কাজও কোরো না!

গাড়িতে ঢুকো না!

টান দিয়ে দরজা খুললাম। সীট আর ড্যাশবোর্ড উজ্জ্বল আভায় চকচক করছে।

সরো, মুসা। সরে যাও। সুযোগ থাকতে থাকতে। আমার মন হুঁশিয়ার করছে আমাকে।

স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে উঠে বসলাম আমি। থরথর করে কাঁপছে এখন সাদা আলো।

দরজাটা লাগিয়ে দিলাম।

আঙুলগুলো চেপে বসল স্টিয়ারিং হুইলে। ঠাণ্ডা, মসৃণ অনুভূতি।

কিট্ করে লেগে যেতে শুনলাম দরজার তালা। আরেকবার আটকা পড়লাম আমি।

চোখ মিটমিট করতে লাগলাম। আলোটা চোখে সয়ে আসার অপেক্ষা করছি।

আমি যে একা নই, সেটা বুঝতে সময় লাগল।

ফিরে তাকালাম। প্যাসেঞ্জার সীটে আমার পাশে বসে আছে কেউ।

আগাগোড়া কালো পোশাক পরা সোনালি চুল একটা মেয়ে।

মুখ দেখতে পাচ্ছি না। অন্য দিকে ঘুরে রয়েছে। তবে সে যে কে, বুঝতে মোটেও অসুবিধে হলো না আমার।

'টিনা!' মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার।

ধীরে ধীরে মুখ ঘোরাল সে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গেলাম। শব্দ বেরোল না।

টিনা নয়!

ভয়ঙ্কর একটা চেহারার দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি। কালচে-গোলাপি রঙের পচা চামড়া। কোথাও ফোলা, কোথাও ভাঁজ, কোথাও ছেঁড়া-উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। গভীর অক্ষিকোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে ঝুলছে দুটো ভেজা ভেজা চোখ। ভাঙা, খসে যাওয়া নাক। খুলির ফুটো দুটো বেরিয়ে আছে। দাঁতহীন সবুজ মাড়ী।

হলদে লালা গড়াচ্ছে। ওপরের ঠোঁটের অনেকটাই নেই, পচে খসে পড়েছে। নিচের ঠোঁটের যা-ও বা আছে, বীভৎস ভাবে ফোলা।

তীব্র মাংস পচা দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগতে গুঙিয়ে উঠলাম আমি।

মুখটা এগিয়ে এল আমার দিকে। ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে ফেললাম। এত কাছে চলে এসেছে, নাকের ফুটো দিয়ে কিলবিল করে বেরিয়ে আসা সাদা ক্রিমি দুটোও দেখতে পাচ্ছি।

ওর সোনালি চুল মুখ ছুঁয়ে গেল আমার। শণের মত শক্ত হয়ে গেছে চুলগুলো। পোকায় ভর্তি।

আগুনের মত গরম, দুর্গন্ধে ভরা নিঃশ্বাস এসে পড়তে লাগল আমার মুখে। গুলিয়ে উঠল গা। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। দাঁতহীন মাড়ী নেড়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'আমি খারাপ···আমি খুব খারাপ!'

## বিশ

আবার মোচড় দিয়ে উঠল আমার পেটের মধ্যে। সব ঠেলে উঠে আসতে লাগল ওপরে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম বমি ঠেকানোর জন্যে।

ওর চুল আবার আমার গাল ছুঁয়ে গেল। মনে হলো যেন শণের ডগা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চামড়া চুলকাতে শুরু করল।

ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলাম। গাড়ির ভেতরে ভয়ানক ঠাণ্ডা।

মৃত্যুর মত শীতল, মনে হলো আমার।

'আমি খারাপ! মুসা, খুব খারাপ!' তার ফিসফিসে কণ্ঠ আরেক দফা দুর্গন্ধ ছুঁড়ে দিল আমার নাকে।

সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম।

ওর পচা, দন্তহীন মাড়ীর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাইলাম মাথাটা।

দরজার হাতল ধরে টান দিলাম। একই সঙ্গে গায়ের জোরে ঠেলতে থাকলাম দরজাটা।

জানালার গোড়ায় খামচি মারলাম। কিল মারতে শুরু করলাম কাঁচে।

'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো? বের করে নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করলাম। বরফ-শীতল দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে থরথর করে কাঁপছি আমি।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম আবার।

ফিরে তাকিয়ে দেখি মাথা ছুঁড়ছে মেয়েটা। মুখ হাঁ করে কুৎসিত হাসি হাসছে। মনে হচ্ছে যেন শুকনো হেঁচকি তুলছে।

'খুব খারাপ···'

তারপর হঠাৎ করেই শুরু হলো তার পরিবর্তন। আরও আতঙ্কিত করে দিল আমাকে। কালো চোখ দুটো গিয়ে জায়গামত বসে গেল। গলিত চামড়া পুরোপুরি গলে যেতে শুরু করল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। ড্যাশবোর্ডে বাড়ি খেল মাথা। শক্ত সোনালি চুলগুলো মোচড় খেতে লাগল ক্রিমির মত।

গলছে আর প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। গলছে···গলছে···ছোট থেকে ছোট হচ্ছে শরীর।

আমি নড়তে পারছি না। শ্বাস নিতে পারছি না।

ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে বসে থেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওকে গলে যেতে দেখছি। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়। সবুজ ধোঁয়ার মত এক টুকরো গ্যাস ঝুলে রইল সীটের ওপর।

ধীরে ধীরে গ্যাসটাও কমতে কমতে মিলিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে চাপ লাগছে আমার। খেয়াল করলাম, দম আটকে রেখেছিলাম। হুস্ করে ছেড়ে দিলাম বাতাসটা।

'হালো?' দুর্বল কণ্ঠে ডাক দিলাম। 'তুমি কি আছো এখনও?'

আমার কথার জবাবেই যেন চালু হয়ে গেল গাড়ির ইঞ্জিন।

শব্দ বাড়তে লাগল। গীয়ারশিফট বদল হলো।

'না না, দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলাম।

ঝাঁকি দিয়ে ড্রাইভওয়ে ধরে পিছাতে শুরু করল গাড়ি। বেরিয়ে এল রাস্তায়। আবার গীয়ার বদল হলো। আচমকা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। ছুটতে শুরু করল তীব্র গতিতে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল চাকা। খেপে গিয়ে বন্য হয়ে উঠল যেন গাড়িটা। দুলে দুলে নাক ঘুরিয়ে রাস্তার এদিক সরে যায় একবার, আবার ওদিক।

স্টিয়ারিং চেপে ধরে পাগলের মত ঘোরানো শুরু করলাম। কিন্তু কোনমতেই আমার নিয়ন্ত্রণে এল না গাড়িটা।

রাস্তা থেকে যখন লাফ দিয়ে নেমে গেল, আবার চিৎকার করে উঠলাম। ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল ঘাসের ওপর দিয়ে। লম্বা একটা পাতাবাহারের ঝাড় ভাঙল। আবার উঠে এল রাস্তায়। এক জায়গায় থেকে বন্‌বন্ করে ঘুরতে শুরু করল।

'থামো! থামো! গাড়ি থামাও!' চিৎকার করতে লাগলাম আমি। 'তুমি কে? কেন করছ এত কাণ্ড?'

গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দ আর ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল মেয়েটার হাসি।

'কেন?' আরও জোরে চিৎকার করে উঠলাম। 'বলো আমাকে। আমি জানতে চাই সব।'

রাস্তার মাঝখান ধরে ছুটল গাড়ি। চাকার সেই একই রকম তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। গাড়ির নাক একবার এদিকে ঘুরে যাচ্ছে, আবার ওদিক। পাগলের মত হয়ে গেছে যেন। মোড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে তীব্র গতিতে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি। আরও! আরও! আরও!

স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল মেয়েটার কণ্ঠ, 'এই গাড়িটাতেই মারা গেছি আমি, মুসা। এবার তোমার পালা।'

## একুশ

'না, দাঁড়াও, দাঁড়াও!' অনুরোধ করতেই থাকলাম। 'আমার কথা শোনো! আমি···আমি এখনই মরতে চাই না!'

আবার শোনা গেল হাসি।

দ্রুত পাশে সরে গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল গাড়িটা। একটা গাছের সঙ্গে ঘষা লাগাল। লাফাতে লাফাতে আবার উঠে এল রাস্তায়।

মরতেই হবে, বুঝে গেলাম।

গাড়িটাকে অ্যাক্সিডেন্ট করাবেই সে। ভূতের হাতে আমি পুরোপুরি অসহায়। নিজেকে বাঁচানোর কোন উপায়ই নেই আমার।

দুই বার চাকা পিছলাল। দুই বার বন্‌বন্ করে ঘুরল। তারপর নিজেকে যেন বাঁক নিয়ে ঘুরে যাওয়া রাস্তায় ছুঁড়ে মারল গাড়িটা। ছুটতে থাকল শহর আর উপত্যকার দিকে।

'দোহাই তোমার···' আবার শুরু করলাম। কিন্তু কথাগুলো আটকে গেল আমার গলায়। 'আমি···আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস হয়েছিল আমার,' স্পীকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর। 'মাত্র চোদ্দ, মুসা।'

'আমার কি আর বেশি নাকি!' চিৎকার করে উঠলাম। আচমকা তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে গাড়িটা ঘুরে যেতেই আমার মাথাটা গিয়ে বাড়ি খেল জানালার কাঁচে।

এই সময় কানে এল সাইরেনের শব্দ। আমার পেছনে।

পুলিশের গাড়ি!

আশা দুলে উঠল বুকের মধ্যে। ওরা বাঁচাবে আমাকে! গাড়িটা থামাবে। আমাকে বের করে নেবে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠে পা'টা পুরোপুরি চেপে ধরলাম ব্রেকের ওপর।

মেঝের সঙ্গে প্রায় ঠেকে গেল পেডালটা। কিন্তু সামান্যতম গতি কমল না গাড়ির। ইঞ্জিনের গর্জন তুলে ছুটতেই থাকল।

পেছনে কাছে এসে যাচ্ছে সাইরেনের শব্দ।

'থামো!' চিৎকার করে উঠলাম। 'পুলিশ আসছে! গতি কমাও!'

সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দকে ছাপিয়ে খনখন করে বেজে উঠল তার নিষ্ঠুর হাসি।

আবার ব্রেকে পায়ের চাপ দিলাম। আবার।

মিররে লাল আলোর ঝিলিক জ্বলতে-নিভতে দেখছি।

পুলিশ কি আমাদের ধরতে পারবে? থামাতে পারবে গাড়িটা? দুর্ঘটনা ঘটার আগেই উদ্ধার করতে পারবে আমাকে?

## বাইশ

অনেক কাছে চলে এসেছে সাইরেনের শব্দ।

মিররে ঝিলিক দিয়েই চলেছে লাল আলো।

বাঁ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। আমাদের ছুটন্ত গাড়ির পাশ দিয়ে।

দেখলাম, ওটা পুলিশ কার নয়। লম্বা একটা দমকলের গাড়ি। সাইরেনের শব্দ করতে করতে আমাদের আগে চলে গেল গাড়িটা।

ট্রাকটার পেছন দিকে তাকিয়ে আছি আমি। দুই পাশ থেকে দুটো মইয়ের মাথা উঁকি দিচ্ছে। দ্রুতবেগে মোড়ের কাছে গিয়ে অন্য পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হতাশার নিঃশ্বাস।

'মাত্র চোদ্দ,' মেয়েকণ্ঠটা বলল আবার। দমকলের গাড়িটার যেন কোন অস্তিত্বই নেই তার কাছে।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। ছুটে যাচ্ছে পাহাড়ের কিনারের দিকে।

'গাড়িটা নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম আমি। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম, মুসা। মারা গিয়েছিলাম। তারপর থেকেই গাড়িটাকে আসর করে রেখেছি। অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি কোনও একজনের, উপযুক্ত কেউ, যার বয়েস আমার কাছাকাছি হবে, আমাকে বুঝবে, যে আমাকে সঙ্গ দিতে পারবে। তোমাকে পেয়েছি।'

'না না, দোহাই তোমার!' চিৎকার করে উঠলাম।

জোরে জোরে লাফানো শুরু করল গাড়িটা। সেই সঙ্গে ঝাঁকি খেতে লাগল আমার দেহটাও।

'তুমি এ ভাবে মরে যাওয়াতে খারাপ লাগছে আমার,' আমি বললাম। 'সত্যি খারাপ লাগছে। কিন্তু তোমার সঙ্গী হতে আমি রাজি নই। দোহাই তোমার, আমাকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

নীরবতা।

তারপর চাকা পিছলাল। রাস্তায় ঘষা খেয়ে তীব্র আর্তনাদ তুলল টায়ার।

পাগলের মত ঘুরতে শুরু করল গাড়িটা। একবার। দু'বার।

ঘোরা বন্ধ হলো।

'তুমি বাড়ি যেতে চাও?' ভূতটা জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'চাই! চাই! আমাকে বাড়ি নিয়ে যাও!'

'বেশ,' জবাব দিল সে। গাড়ির ভেতরের ঠাণ্ডার মতই ঠাণ্ডা তার কণ্ঠস্বর। 'মুসা, আমি তোমাকে বাড়িতেই নিয়ে যাব।'

ঝাঁকি দিয়ে আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। লাফাতে থাকা স্টিয়ারিংটা শক্ত হাতে চেপে ধরে রেখে জানালা দিয়ে তাকালাম।

ফিরে চলেছি আবার।

আমাদের বাড়ির দিকে।

'সত্যি যাচ্ছ?' হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে আমার। 'সত্যি আমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ?'

'সেখানেই যদি মরার ইচ্ছা হয় তোমার,' জবাব এল, 'আমার অসুবিধে কি? ওখানে গিয়েই মরতে পারবে। তোমাদের বাড়ির সামনে।'

'না না, শোনো…'

গতি বাড়ছে গাড়ির। দেখতে দেখতে এতটাই বেড়ে গেল, মনে হলো উড়ে চলেছি আমরা। মোড়, বাঁক, এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া পাহাড়ী রাস্তা–কোনখানেই সামান্যতম গতি কমল না গাড়ির।

ধূসর ঝিলিকের মত পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়িঘরগুলো। আমাদের পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। নিজেদের ব্লকটা চিনতে পারলাম।

দ্রুত। আরও দ্রুত।

অনবরত পা চেপে চলেছি ব্রেক পেডালে। স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছি।

অসহায়। পুরোপুরি অসহায় আমি।

আমাদের বাড়ির সামনে নিয়ে দুর্ঘটনাটা ঘটাবে। বুঝতে পারছি।

'বেশি কষ্ট পাবে না,' যেন আমার ভাবনাগুলো পড়তে পেরেই বলে উঠল ভূতটা। 'তারপর আর কি। অনন্তকাল ধরে একসঙ্গে বাস করব আমরা।'

## তেইশ

চোখ বুজে ফেললাম আমি।

দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। চাকা ঘষার আর্তনাদ কানে এল।

চোখ মেললাম। সামনে কমলা রঙের একটা দেয়াল।

আগুন!

আমাদের বাড়ি! আমাদের বাড়িটায় আগুন ধরেছে!

সামনের চত্বরে দমকলের গাড়ি। গম্ভীর-মুখো পড়শীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ড্রাইভওয়েতে।

কে ওটা? ফারিহা না? হ্যাঁ। আমার বাবা-মা'র সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সে। মুখে আগুনের শিখার আভা নাচছে। কমলা আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের আতঙ্কিত মুখে প্রচণ্ড উদ্বেগ।

'আমি···আমার তো এখন বাড়িটার ভেতরে থাকার কথা!' ভূতটাকে বললাম আমি। 'ঘরের মধ্যে ঘুমানোর কথা। ওখানে থাকলে এতক্ষণে মরে যেতাম। আমাকে তো আসলে বাঁচালে তুমি। আমার জীবন বাঁচালে।'

'না-আ-আ!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে শুনলাম ওকে। 'কাউকে বাঁচানো আমার নিষেধ!'

আবার দেখতে পেলাম ওকে। ভয়ঙ্কর বিকৃত সেই পৈশাচিক মুখটা। শণের মত সোনালি চুল। মৃত মেয়েটার গলিত মুখ। কালো পোশাক পরা।

আবার আমার পাশে এসে বসল সে। দন্তহীন মাড়ী ফাঁক হলো। বেরিয়ে এল আতঙ্কিত চিৎকার। মাংস খসে যাওয়া হাতের কংকালের মত আঙুল দিয়ে অনবরত খামচি মারতে শুরু করল চুলে। মাংস-চামড়া সহ গাদা গাদা চুল তুলে নিতে লাগল খাবলা দিয়ে দিয়ে।

ক্রমাগত আর্তনাদ করে চলেছে, 'আমি খারাপ! খুব খারাপ! ভাল তো আমি করতে পারি না!'

'কিন্তু করেছ,' আমি বললাম। 'ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে আমি বেঁচে গেছি। তুমি একটা ভাল কাজ করে ফেলেছ।'

'তারমানে আমি ব্যর্থ! আমি ব্যর্থ! ভুল করে ভাল কাজ করে ফেলেছি আমি! আমার জগতে ভুলের ক্ষমা নেই। চিরকালের জন্যে মরতে হবে এখন আমাকে।' চিৎকার করতে লাগল ভূতটা। মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়ে আনতে লাগল দুই হাতে।

এই না হলে ভূতের বুদ্ধি! এত দুঃখের মাঝেও হাসি পেল আমার। আগুন থেকে বেঁচেছি, এখন আমাকে অন্য ভাবে মেরে ফেললেই হয়। তাহলেই তো তার মিশন সাকসেসফুল হয়ে যায়। কিন্তু সেই কুবুদ্ধি আর দিতে গেলাম না। বরং ওর দুর্বলতা বুঝে বার বার বলতে লাগলাম সে ভাল কাজ করেছে। ওর যুক্তিহীন, দর্বল, ভুতুড়ে মগজে ধারণাটা বদ্ধমূল করে দিতে থাকলাম।

ওর কুচকুচে কালো চোখ দুটো আমার দিকে ঘুরল। যেন কালো আগুনের টুকরো। রাজ্যের ঘৃণা মেশানো তাতে।

আবার গলতে আরম্ভ করল সে।

চোখ দুটো ঘুরছে অক্ষিকোটরের মধ্যে। হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এল। টুপ টুপ করে এসে পড়ল কোলের ওপর। ফটাস্ করে দুই ভাগ হয়ে গেল খুলিটা। সামনের দিকে ঢলে পড়ল দেহ।

হতবাক হয়ে দেখছি তার গলে যাওয়া। গলতে গলতে কিছুই থাকল না আর এক টুকরো সবুজ গ্যাস বাদে। সেটাও উধাও হয়ে গেল এক সময়।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দরজা।

শক্ত হাত টেনে বের করে নিল আমাকে।

জড়িয়ে ধরল আমাকে বাবা। মা যোগ দিল তার সঙ্গে।

'তুই ভাল আছিস, মুসা! বাবা! তোর কিছু হয়নি তো?' আমাকে ধরে কাঁদতে শুরু করল মা।

'আমরা তো ভেবেছিলাম ভেতরে আটকা পড়েছিস তুই!' বাবা বলল।

ফারিহা ছুটে এল আমার কাছে। ওরও গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'মুসা, আমরা ভেবেছি তুমি মরেই গেছ! পুড়ে মরেছ ঘরের মধ্যে!' মা'র মত সে-ও কেঁদে ফেলল।

'ভূতটা বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে,' আগুন আর হোস পাইপের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোনো পানির গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বললাম আমি। 'গাড়িতে করে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সে-জন্যেই এখনও বেঁচে আছি।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল বাবা আর মা। বুঝতে পারলাম, এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছে না ওরা।

পরোয়াই করলাম না। বেঁচে যে আছি, তাতেই আমি খুশি।

বাড়ির ছাতের একটা বড় অংশ বিকট শব্দ করে খসে পড়ল আগুনের ওপর। চমকে গেলাম চারজনেই।

'দোষটা আমারই,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বাবা। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ওসব তার-ফার ঘাঁটাঘাঁটি করাটা মোটেও উচিত হয়নি আমার। যে যেটা জানে না, সেটা নিয়ে ওস্তাদী করতে গেলে যা হয়। জীবনে যদি আর ইলেকট্রিসিটি নিয়ে খেলতে যাই আমি।'

তারের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনটা ধরেছে, বুঝতে পারলাম।

'যা হবার হয়েছে,' মোটেও দুঃখিত মনে হলো না মাকে। 'সবাই যে আমরা ভাল আছি, এতেই খুশি আমি।'

কিন্তু মা'র কথায় কান নেই আমার। তাকিয়ে আছি ভূতটার দিকে। আবার এসেছে।

টিনা!

# চব্বিশ

'মুসা!' আমার দিকে দৌড়ে আসতে লাগল টিনা। ওর সোনালি চুল কাঁধের ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে।

এক পা পিছিয়ে গেলাম। গলার মধ্যে চাপ। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। বললাম, 'তুমি···তুমি আমাকে বলেছ চিরকালের জন্যে মরে যাচ্ছ!'

'মানে?' চোখের পাতা সরু করে আমার দিকে তাকাল টিনা। 'মুসা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'থাক, আর ভান-ভণিতার দরকার নেই,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আমার কণ্ঠ। 'নিরীহ ভালমানুষ সেজে আর ভোলাতে পারবে না আমাকে। তুমি খারাপ!'

চেহারার ভাব বদলে গেল তার। খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। 'এসো আমার সঙ্গে!'

'না!' বাধা দিতে গেলাম। 'যথেষ্ট তো করেছ, আর কত? দোহাই তোমার···'

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাকে ছাড়ল না সে। টেনে নিয়ে চলল রাস্তার দিকে।

'কি করছ তুমি?' চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি জানি তুমি ভূত, টিনা। আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমি তোমার ছবি দেখেছি। দুই পাশে মোম জ্বালানো।'

আমার কব্জিতে আরও চেপে বসল তার আঙুল। চোখে চোখে তাকাল। চোখ জ্বলছে। 'আমি বেঁচেই আছি, মুসা,' ফিসফিস করে বলল সে। আমার মুখের সামনে মুখটাকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমাকে কি মরা মনে হচ্ছে? এই যে তোমার হাত ধরে আছি, এটা কি ভূতের হাত?'

'কিন্তু···' বলতে গেলাম।

'যে ছবিটা তুমি দেখেছ,' আমাকে বলতে দিল না সে, 'ওটা আমার নয়। আমার যমজ বোন, রিনার। বেঁচে থাকতেও রিনা খুব খারাপ ছিল।'

'তোমার বোন?' দম আটকে যাচ্ছে আবার আমার।

'হ্যাঁ। একদিন গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল রিনা। কি করে চালাতে হয় তা-ও জানত না। অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল।' আবেগে ধরে এল টিনার গলা। 'বাবার মন একেবারে ভেঙে গেল। আর কোনদিন স্বাভাবিক হলো না।' চোখ নামাল সে।

'আমি···সরি!' বিড়বিড় করে বললাম।

'তারপর থেকেই গাড়িটা বিক্রির জন্যে অস্থির হয়ে উঠল বাবা।' লম্বা দম নিয়ে আবার বলল টিনা, 'রিনা যে গাড়িতে মারা গেছে, সেটা চালানোর মত আর মানসিকতা ছিল না তার। তোমরা যখন গাড়িটা কিনতে এসেছিলে, আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। পরে এসে বাবার কাছে শুনলাম গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম, আসল কথা গোপন রেখে গাড়িটা তোমাদের গছিয়েছে বাবা। ভাল লাগেনি আমার ব্যাপারটা। ঠিক করলাম, তোমাদের সাবধান করতে হবে।'

'সাবধান?' ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। 'তারমানে তুমি জানতে

গাড়িটাকে আসর করে রেখেছিল তোমার বোন? জানতে আমাকে খুন করতে চাইছে সে?'

মাথা ঝাঁকাল টিনা।

'কি ভাবে?' ভুরু নাচালাম আমি। 'কি ভাবে জানলে তুমি?'

'ও আমাকে বলেছে,' জবাব দিল টিনা। 'একদিন গাড়িতে বসে বাবার আসার অপেক্ষা করছি। রিনা এসে উদয় হলো। ভয়াবহ একটা জ্যান্ত লাশ। আমাকে বলল, গাড়িটাতে বাস করে সে। বলল, গাড়িটাকে আসর করেই রাখবে সে। প্রতিশোধ নেবে। এত অল্প বয়েসে মারা যাওয়ার প্রতিশোধ।'

'আমাকে আগে বললে না কেন সে-কথা?' জিজ্ঞেস করলাম। 'কেন তুমি...'

'বলতে আমি চেয়েছিলাম,' বাধা দিয়ে বলল টিনা। 'কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে কিনা। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষে ফোন করেছিলাম তোমাকে। তুমি জবাব দিলে, সত্যি কথাটা তুমি জেনে ফেলেছ। ভাবলাম, জানোই যখন, তোমাকে সাবধান করার আর প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলেছ,' রাগ যাচ্ছে না আমার। 'ফ্র্যাঙ্কলিনদের বাড়িতে তো তুমি থাকনি।'

'কে বলল থাকিনি?' অবাক মনে হলো টিনাকে। 'তাহলে তোমাদের ওপর সব সময় চোখ রাখতাম কি করে?'

রাতের বেলা কি ভাবে ওই বাড়িতে গিয়ে খুঁজে এসেছি আমি আর ফারিহা, জানালাম ওকে।

'অ, এই কথা,' টিনা বলল। 'আমি নিশ্চয় তখন রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। বাড়ির ভেতরে ঢুকলে দেখতে পেতে একটা ব্যাকপ্যাক আর স্লিপিং ব্যাগ আছে। ওগুলো আমার। বিশ্বাস না হলে চলো এখন, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল আমার মুখে। বললাম, 'রিনা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করে বাঁচায়নি। ভুল করে বাঁচিয়েছে।'

ঘটনাটা খুলে বললাম টিনাকে।

বিষণ্ন হাসি হাসল সে। চোখ থেকে পানি মুছে ফেলল। গাড়িটার দিকে ঘুরল। 'বেচারি রিনা!' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমাকে বলল, 'গাড়িটা নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে তুমি...'

'আক্কেলও হয়েছে তাতে যথেষ্ট,' জবাব দেয়ার সময় কেঁপে উঠল আমার কণ্ঠ। 'গাড়ির ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ আমার শেষ। আর এর মধ্যে নেই আমি। এরচেয়ে বাস্কেট বল কিংবা হকিতে মনোযোগ দেয়া বরং অনেক ভাল। এখন থেকে সেটাই করব।'

*

পাশের বাড়ির হ্যামিলটনদের বাড়িতে রাত কাটালাম আমরা সেদিন। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে মা বলল আমাকে, 'তোর জন্যে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমাদের, মুসা। এই যে কি সব ভূতের কথাটথা বলছিস।'

'কিন্তু মা...' বলতে গেলাম।

'ভাবছি, ডাক্তারের কাছেই নিয়ে যাব তোকে।'

ব্যস, গেলাম রেগে। ঠেলা মেরে দুধের বাটিটা সরিয়ে রাখলাম। 'মা, আমি রোগী নই! কেন বুঝতে পারছ না? এক বর্ণ বানিয়ে বলিনি আমি...'

শব্দ শুনে থেমে গেলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে

ঢুকছে বাবা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'শহরে যাওয়ার দরকার ছিল খুব। কিন্তু গাড়িটা স্টার্টই হচ্ছে না। গ্যারেজে ফোন করে মেকানিককে খবর দিতে হলো শেষে…'

দরজায় টোকা পড়ল।

ঘুরে তাকালাম সবাই। ধূসর ইউনিফর্ম পরা একজন লোক, হাতে টুলবক্স নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো নীল গাড়িটা দেখে এসেছেন না? ওটাই। স্টার্ট নিচ্ছে না,' বাবা বলল। 'চলুন, দেখাচ্ছি।'

ওদের পেছন পেছন গাড়ির কাছে এলাম আমিও। আমাদের বাড়ির পোড়া ধ্বংসাবশেষগুলো থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে দেখতে পেলাম। আঙিনাগুলো বোঝাই হয়ে আছে ভাঙা কাঁচ আর পোড়া কালো কাঠে। বাতাস ধোঁয়ার গন্ধে ভারী হয়ে আছে।

গাড়িটার সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়াল মেকানিক। টান দিয়ে হুড খুলে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকল। এক নজর দেখেই ফিরে তাকাল বাবার দিকে। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

বাবা তো অবাক। 'ব্যাপার মানে?'

ইঞ্জিনের দিকে আঙুল তুলল লোকটা। 'ব্যাটারিটা কি করেছেন? ব্যাটারি ছাড়া স্টার্ট হবে কি করে?'

বিমূঢ়ের মত হেঁটে গিয়ে মেকানিকের পাশে দাঁড়াল বাবা। ইঞ্জিনের দিকে তাকাল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বোকার মত তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ফিরল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাটারি নেই! এতদিন তাহলে চালালাম কি করে? কাল রাতেও চলল…'

দরাজ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা মুখ জুড়ে। এতদিনে বোঝাতে পারলাম তাহলে। বাবা যখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, মাকে বোঝানোও আর কঠিন হবে না।

***